শাস্ত্রবিরোধিতা, ছয়ের দশক

অশোক চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রবিরোধিতা—ছয়ের দশকের এই আন্দোলন মূলত ফর্ম ভাঙার। সেই সূত্রেই নতুন কিছু করতে চেয়েছেন শাস্ত্রবিরোধীরা। কিন্তু নিজেদের শিল্পতত্ত্ব বা শিল্পাদর্শ সম্পর্কে কোনো সুসংহত বক্তব্য হাজির করতে পারেননি। এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন আন্দোলনেরই শরিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়।—সম্পাদক।

সম্পাদক চেয়েছেন ছয়ের দশকের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ লেখা। আমি ছয়ের দশকেরই একজন কবি এবং ওই দশকের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই কমবেশি সম্পৃক্ত ছিলাম—এসব ভেবেই হয়তো এই ফরমায়েশ। কিন্তু ব্যাপারটা এতটাই সহজে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। প্রথম যৌবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রায় তিরিশ বছর আগের আবেগ-উত্তেজনাময় ঘটনাপুঞ্জ একটা লেখায় উপস্থাপন করা বেশ কঠিন। বিশেষত ব্যাপারটা ঐতিহাসিক। সে সময় প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে রাশিরাশি বুলেটিন, পত্রপত্রিকা, হ্যান্ডবিল, পোস্টার প্রভৃতি প্রচারিত হত। সব মনে বা সংগ্রহে রাখা সম্ভব নয়। তবু আমার সংগ্রহ খুব খারাপও নয়। অবশ্য আমি সম্ভব মতো সবই রাখি এবং ঠিক সময়ে খুঁজে পাই না। এই সব অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়েই এই লেখা শুরু করলাম।

এসব লেখার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সন-তারিখ আর মান নির্ধারণ—মানে ভাল-মন্দের বিচার। প্রথমত সন তারিখ আজ আর ততটা জরুরি নয়। কেন না এগুলি ইতিমধ্যে আলোচিত ও বহুজ্ঞাত। বিশেষত আমাদের সময়ের দুজন বিশিষ্ট লেখক শ্রীঅতীন্দ্রিয় পাঠক ও উত্তম দাশ স্থান কাল নথিপত্র সহ এই সব আন্দোলনের বিশদ আলোচনা করেছেন যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে। এগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমি এ দুটি বই থেকেই সংগ্রহ করে এখানে ব্যবহার করলাম। কিন্তু শুধুমাত্র কালানুক্রম রক্ষা ছাড়া এ লেখায় ওই সব প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনীয়। সন-তারিখের নির্ঘণ্ট ও বিভিন্ন আন্দোলনের ইস্তাহার ঘোষণা প্রভৃতি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলিও বহুজ্ঞাত এবং আন্দোলনকারীদের নানা ঘোষণা ও দাবি ও নানা বিরোধিতায় জটিল, বিতর্কিত। আমি এখানে প্রধানত ইদানীংকাল পর্যন্ত অনালোচিত এই সব আন্দোলনের কিছু নেপথ্য কাহিনী—বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা করব। স্বভাবতই এ আলোচনায়—সুতরাং কিছু ব্যক্তিগত রুচি, কিছু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকবে, এ আশঙ্কা অমূলকও নয়। যে কোনো লেখাতেই লেখকের অহংকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সে ঝুঁকি নিতেই হবে। আর পক্ষপাতিত্ব যেমন লেখকের প্রবণতা, নিরপেক্ষতাও তেমনি তার পরীক্ষা। আমাকেও এ পরীক্ষা দিতে হবে।

।। এক ।।

ছয়ের দশক—অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল। এই সময়ের পুরো ছবি তার রং রেখা আবেগ উত্তেজনা এবং সাহিত্যের পটভূমি আগে বোঝা দরকার। তিরিশ থেকে বাংলা সাহিত্যে দশক ভাগের রীতি চালু হয়েছে। বিদেশি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ও অভিজ্ঞতায় তিরিশের তরুণ লেখক সম্প্রদায় তৎকালীন রাবীন্দ্রিক ভাবালুতা ও ঐতিহ্য-মণ্ডিত বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—শুধু আদর্শ ও ভাববাদ নয়, সমাজের নিচুতলার মানুষের বাস্তব জীবন, তাদের কামনা-বাসনা এ সব সাহিত্যে স্থান পেল। আবার চল্লিশে এই বাস্তবতার রূঢ় উচ্চনাদে ক্লান্ত, নম্র আদর্শবাদী এক শ্রেণীর রচনা এবং পঞ্চাশেও চল্লিশের বিপরীত উচ্চকণ্ঠ ও রূঢ় বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ। সময়ের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের মাত্রা, ভাষা ও প্রকরণ ভিন্ন হবেই। কিন্তু দশকে-দশকে এই স্পষ্ট বিরুদ্ধতা দেখা গেছে। এটা প্রত্যাশিতও বটে এক সময়ের সাহিত্যরুচি তা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন অব্যবহিত পরের কালের লেখকদের পক্ষে তা বর্জনীয়। তখন তাকে অতিক্রম করে অন্যতর রীতি ও প্রকরণ সৃষ্টির তাগিদ দেখা দেয়।

এই নিয়মেই পঞ্চাশের উদ্দাম যৌবন ও সোচ্চার সাহিত্যরুচির বিরুদ্ধে সেই প্রথম অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ থেকেই ছয়ের দশকে একটা নম্র আত্মমগ্ন সাহিত্যরুচি আভাসিত হয়। কিন্তু এটাও সত্য এবং পরবর্তী আলোচনায় তা স্পষ্টতর হবে যে ছয়ের দশকেই একটা ভিন্ন স্রোত ছিল। তারা পাঁচের দশকের মুগ্ধতা সর্বাংশে ত্যাগ করতে পারেনি। অবশ্য এটা খুব নতুন কিছু নয় এবং পূর্ববর্তী দশকেও এরকম অনেক উদাহরণ আছে। একটা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারাকে অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি সবার থাকে না। তিনের দশকেও স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, নিশিকান্ত, প্রমথনাথ বিশী বা এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রও মূলত রাবীন্দ্রিক ধারাতেই কবিতা লিখেছেন এবং এঁরাও সেসময় তরুণ-কবি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন। তবে ষাটের গরিষ্ঠতম প্রথাবিরোধী লেখকদের সংগে অবশ্যই এই ব্যতিক্রমীদের আলাদা করে নেয়া কঠিন নয়। এবং আজ ষাটের সাহিত্য বলতে বিদগ্ধ সাহিত্য পাঠক মাত্রেই ওই গরিষ্ঠ ষাটকেই বোঝেন।

আত্মমগ্ন কল্পনাপ্রবণ কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। সতর্কতা ও সচেতনতা অতীত ও সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যকার সম্পর্কে। এ সচেতনতা না থাকলে কোনো তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকদের মতোই ষাটের শীর্ষস্থানীয় লেখকরা বুঝেছিলেন অতীতের অনুবর্তনে কোনো সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। অতীতকে অনুসরণ ও অনুধাবন করে মহত্তর সৃষ্টিই নতুন লেখকের অভীষ্ট। এইসব কথাই ষাটের আন্দোলনকারীরা পরবর্তীকালে তাঁদের ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন। এবং এইসব আদর্শেই—ষাটের তরুণ লেখক সম্প্রদায় নানা সময়ে নানা গোষ্ঠীতে দলে-উপদলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজেদের সাহিত্য আদর্শ ও নীতি নির্ণয় করলেন।

একথা ঠিক ওইসব বিভিন্ন দলের নীতি ও আদর্শের বা ওইসব গোষ্ঠীর শ্রেণীভুক্ত লেখকদের সাহিত্যরুচি ও সৃজনক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। অবশ্য এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিতই। কোনো সাধারণ নিয়মে বা আদর্শে কঠোরভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো গণআন্দোলন অন্তত সাহিত্যে সম্ভব নয়। এখানে ছোট-ছোট দলে বিচ্ছিন্ন-ভাবে নানা জাতীয় কিছু প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। এইসবের সমন্বয়ে একটা সময়ে এক বা একাধিক আন্দোলন দানা বাঁধে। তিনের দশকে কল্লোল, কালিকলম, সবুজপত্র সবই এক-একটা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ধারা। কেউ সনাতন, কেউ মধ্যপন্থী কেউ আধুনিক—সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত চেতনা। ষাটেও প্রায় একই রকম ঘটেছে। যেটা বেশি বা আলাদা রকম, সেটা হচ্ছে—প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এইসব গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর সদস্য লেখকরা একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, অপসমালোচনা ইত্যাদির দ্বারা বিরোধ ও বিতর্কে এতটাই নিন্দনীয়ভাবে মেতে উঠেছিলেন যে তাঁদের সৃষ্টি ক্ষমতার অনেকটাই তার ফলে অপব্যয়িত হয়েছে একথা বলা যায়।

ফলত তিরিশে কল্লোল ইত্যাদি এবং পঞ্চাশে কৃত্তিবাস, শতভিষা প্রভৃতির মতো যৌথ উদ্যোগে কোনো বৃহৎ আন্দোলনের পরিবর্তে ছয়ের দশকে একাধিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন আন্দোলন সূচিত হয়েছে। আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করলে এইসব আন্দোলনের কোনোটিই সম্পূর্ণ নিষ্ফল বা বন্ধ্যা এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ওই ধারাবাহিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিরোধিতায় দীর্ণ ছয়ের দশক বহু সৎ পাঠক ও সমা-লোচকের দ্বারাও বন্ধ্যা দশক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ সম্মিলিত শক্তিতে সংহতভাবে প্রকাশিত কোনো আন্দোলনের তর্কাতীত সাফল্য ও তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে কোনো আন্দোলনের পক্ষেই সেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিছুটা ঈর্ষায় অনেকটাই নিজেদের দোষে। এই হচ্ছে ষাটের সাহিত্য-আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

॥ দুই ॥

ষাটের একেবারে শুরুতে প্রধান পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল— বিদিশা, কবিপত্র, ছোটগল্প, ফসল, সম্প্রতি ইত্যাদি। এগুলি সবই ষাটের তরুণ লেখক কবিদের নিজস্ব কাগজ। এর মধ্যে 'বিদিশা' ও 'ছোটগল্প'—ছোটগল্পের কাগজ, 'কবিপত্র' শুধুই কবিতার। আর হাওড়া থেকে প্রকাশিত ফসল ও সম্প্রতি গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবকিছু নিয়েই প্রকাশিত। তাছাড়া, তিরিশের বিখ্যাত 'কবিতা' চল্লিশের অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত উত্তরসূরী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' বা পঞ্চাশের কৃত্তিবাস ও শতভিষা নিয়মিত / অনিয়মিতভাবে বেরুচ্ছে। এর সঙ্গে চিরকালীন 'পরিচয়' তো ছিলই, আর ছিল দুটি বাণিজ্যিক কাগজ— আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দেশ ও যুগান্তর গোষ্ঠীর অমৃত। এ ছাড়াও কলকাতা ও দূর-নিকট মফস্বল থেকে অগণ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হত। তাদের কিছু—স্মারক, ঋতুপত্র, আগন্তুক, বহ্নিশিখা, দেয়াল, দৃশ্যপট,

মহেঞ্জোদারো, আবলী, পুনশ্চ, গন্ধর্ব, দিগন্ত, ছাড়পত্র, প্রচ্ছদপট এইরকম আরো অনেক পত্রিকা। এগুলি সবই ষাটের কবি লেখকদের কাগজ।

তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এইসব পত্র-পত্রিকার কোনো সংখ্যা বা ওইসবের লেখকদের কোনো না কোনো বই প্রকাশিত হত। এবং ওইসব প্রকাশনা উপলক্ষে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে যা হত তাকে অনুষ্ঠান—প্রায় এক-একটা উৎসব বলা যায়।

এই 'অনুষ্ঠান' প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে আসছে। কফি হাউসের দোতলায় ঢুকে পার্টিশান ঘেরা বাঁদিকের টেবিলে বসতেন পঞ্চাশের অর্থাৎ কৃত্তিবাসের লেখকরা—শক্তি, সুনীল, শরৎ, বিনয়, সমরেন্দ্র, সন্দীপন প্রমুখ। আমরা, ষাটেরা বসতাম হাউসের প্রায় মাঝামাঝি ঈষৎ বাঁদিক ঘেঁসে। সেদিন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রায় কুড়ি পঁচিশজন চারপাঁচটা টেবিল একসঙ্গে করে গোল হয়ে বসেছি। রমানাথ রায় শবযাত্রা বইটা পড়ে শোনাচ্ছে। সেই সময়ের অভ্যাস মতো কেউ-কেউ তিরিশ পয়সার কফি তিনজনে ভাগ করে খাচ্ছি। সঙ্গে পকৌড়াও থাকতে পারে। কিছুই আবশ্যিক নয়। কফি হাউস আড্ডার জায়গা। আড্ডাধারীদের আকর্ষণেই বাইরের লোকেরা আসে। তারাই খায় দায়। আমরা তখন কিছু অর্ডার না করেই কয়েকটি চেয়ার জুড়ে বসে থাকতাম। পরিচিত বা অর্ধপরিচিত কেউ খাবারের অর্ডার দিলে তার প্লেট থেকেই অনায়াসে তুলে নিতুম। তা, সেদিন ওইভাবে আমরা বসেছি। রমা, পবিত্রর বই পড়ছে—এমন সময় সহসাই উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কবি অনন্ত দাশ, 'বাপরে!' বলে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। অনন্ত সেসময় কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ ছিল, স্নায়ুঘটিত কোনো দুর্বলতাও হতে পারে। কিন্তু আমরা ওই ঘটনায় সকলেই হতচকিত হয়ে পড়লাম। পঞ্চাশের আড্ডা থেকে দীপেনদা ও তরুণদা ছুটে এলেন। আমাদের এবং সর্বকালের সকলের বন্ধু সরল হৃদয় আশিস ঘোষ দীপেনদাকে বলল, 'ওর বিচিতে বরফ দিলে হয় না?' যাঁরা কম্যুনিস্ট লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন তাঁরা বুঝবেন বিচি এবং দীপেন্দ্রনাথ এই শব্দ দুটি পাশাপাশি বসলে কী বিপর্যয় হতে পারে। দীপেনদা,—'পাগলামি করো না'—বলেই কিচেনের দিকে দৌড়োলেন এবং গেলাসে করে গরম দুধ এনে অনন্তকে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। তরুণদা (সান্যাল) ততক্ষণে অনন্তর নাড়ী পরীক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনন্ত প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসল। এই সময় পবিত্র আর রমার মধ্যে বিনয় ও কৃতিত্বের প্রায় প্রতিযোগিতা শুরু হল। রমা বলল, 'ওঃ, কি কবিতাই তুই লিখেছিস, অনন্ত শুনেই অজ্ঞান হয়ে গেল।' আর পবিত্র বলছে, 'না, না, লেখাটা নয়, তোর পড়াটাই আসল ব্যাপার।' অনন্তও সে সময় কিছুটা প্রয়োজনীয় বন্ধুকৃত্য কিছুটা লজ্জা ঢাকার জন্যই হয়তো বলল, 'ওঃ কি লেখা লিখেছিস, শুনতে শুনতে মাথাটা ঘুরে গেল।' এইভাবে রটে গেল পবিত্রর কবিতা শুনে অনন্ত অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন অনন্ত পবিত্র বা রমা এসব কথা স্বীকার করবে কিনা জানি না। তবে এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে শবযাত্রা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের

স্মৃতিচারণায় পবিত্র এইসব ঘটনা বিবৃত করে একটি কাগজে লিখেছিল। সে-লেখায় কিন্তু অনন্তর ঘটনার কোনো উল্লেখই ছিল না এবং সেখানে বলা হয়েছে দীপেনদা ও তরুণদা (অনন্তর ঘটনায় ছুটে এসেছিলেন নয়) ওই কবিতা পাঠের টেবিলেই শ্রোতা হিসেবে বসেছিলেন। এটা ভুল অথবা মিথ্যা, অথবা দুটোই। দীপেনদা নেই, তরুণদা তো আছেন। এবং আছেন আরও কিছু ওইদিনের ঘটনার সাক্ষী।

ষাটের কাগজগুলিকে ঘিরে, প্রধানত কবিপত্র, বিদিশা, সম্প্রতিকে নিয়েই একটি বড় লেখক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ফসল ও ছোটগল্প এই বৃত্তের বাইরে ছিল। ষাটের ওই লেখকরা তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাগজ ও তার বাইরে সমমনস্ক কিছু লিটল ম্যাগাজিনে, ক্বচিৎ অগ্রজদের পত্রিকায়—কৃত্তিবাস, শতভিষা বা উত্তরসূরীতে লেখালেখি করতেন। তবে বাণিজ্যিক কাগজের মধ্যে অমৃতই ষাটের তরুণতম লেখকদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে। দেশ পত্রিকায় তখন বয়ঃপ্রাপ্ত অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা-ব্যাকুল পঞ্চাশের ভিড়। তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল। তরুণ লেখক হিসেবে তাঁরাই তখন সেখানে আদৃত। ষাটের সদ্যযুবাদের সেখানে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার কঠিন ছিল। অমৃত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মণীন্দ্র রায়ের উদার প্রশ্রয়ে ষাটের লেখকরা প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হতেন। দেশ পত্রিকার তুলনায় ঔজ্জ্বল্যে নিষ্প্রভ হলেও একটি বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রচার-সুযোগ ও কিছু-প্রেরণা-দক্ষিণা পাওয়া একেবারে আনকোরা লেখক সম্প্রদায়ের কাছে কিছু উপেক্ষণীয় ছিল না। ষাটের প্রথম দিকের প্রায় সবাই—আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মৃণাল দত্ত, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, গণেশ বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে তখন অমৃত পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত লিখতেন।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল—পঞ্চাশের একাংশের সঙ্গে ষাটের একাংশের বিরোধ। আপাত অপ্রাসঙ্গিক এই প্রসঙ্গের সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের গূঢ় সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসেই এর উল্লেখ ও আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করি। পঞ্চাশের শক্তি ও সন্দীপনের বিরুদ্ধে ষাটের পবিত্র ও রমানাথের কিছু ক্ষোভ ছিল—খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পবিত্র সেসময়ে চলনে বলনে বেশ ভূষায় খুবই 'কবি-কবি' ছিল। শক্তি একদিন পবিত্রকে ডেকে বললেন—'তোর ধুতি সাদা, পাঞ্জাবি সাদা, পায়ে একটা সাদা চটিও পরেছিস। এবার মাথায় একটু ঘোল ঢেলে এলেই চমৎকার মানাবে।' এটা শক্তির তৎকালীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, চমক এবং ইমেজ সৃষ্টির চেষ্টা—স্পষ্টতই অসৌজন্য এবং অন্যায়। আবার সদ্য উপহার পাওয়া পঞ্চাশের অন্যতম কবি বন্ধু দিলীপকুমার সেনের কাব্যগ্রন্থ শক্তি পথিমধ্যে অবজ্ঞাভরে অন্যকে দিয়ে দিয়েছে এই সংবাদ রমানাথ দিলীপকুমারকে জানিয়ে দিয়েছে শুনে রমাকে ডেকে শক্তি বলেছিলেন—'তোর ছাল ছাড়িয়ে নোব। মনে রাখিস।' এই ধরনের অমার্জিত ও অপমানকর

ব্যবহার সে সময় অগ্রজ-অনুজ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই করতেন বলে শক্তি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছেন। তবু-এ সবের মধ্যে একধরনের পাগলামি ও চতুরতা ছাড়া অন্য-কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না বলেই মনে হয়।

কিন্তু তরুণ লেখকদের সোচ্চার আত্মপ্রকাশ ও পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধতা করার চিরকালীন প্রবণতাকে ব্যবহার করে রমা ও পবিত্র তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভকে বেশ পরিকল্পিত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করল। তারা নানাভাবে ষাটের তরুণ লেখকদের বোঝাতে লাগল, সামগ্রিকভাবে ষাটের লেখকরা পঞ্চাশের লেখকদের দ্বারা উপেক্ষিত ও অপমানিত। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই ষাটের লেখকদের স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। পূর্ববর্তী সাহিত্যকার ও সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে নতুনরীতি ও প্রকরণ প্রণয়ন ও প্রচারের দ্বারা সাহিত্যে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রবণতা সব যুগে সব নতুন লেখকদেরই থাকে। সুতরাং ষাটের অধিকাংশ তরুণ লেখকই এই উদ্যোগে সম্মিলিত হলেন। এভাবেই ষাটের প্রথম সাহিত্য আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। যথেষ্ট ইতিবাচক তাত্ত্বিক বিতর্ক ও আলোচনার সঙ্গেই একটা সময়ে পঞ্চাশের কিছু লেখকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অতর্কিত অপ্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক মন্তব্য এক সময় আন্দোলনকারীদের অতিরিক্ত উদ্দেশ্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করে।

এর অর্থ এই নয়, ষাটের এই আন্দোলন ব্যক্তিগত দু-একজনের দ্বারা ঘটেছিল বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। উপযুক্ত পরিস্থিতি ও জমি প্রস্তুত ছিলই ও সেইভাবেই এর প্রকাশ ঘটেছে। কিছু সদস্য কৌশলে এই আন্দোলনের সাহায্যে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে মাত্র। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে কারোরই কোনো নিন্দা বা প্রশংসা প্রাপ্য নয়। আমি এসব কথা ঘটনা হিসেবেই বিবৃত করলাম। ব্যাখ্যা অবশ্য আমার নিজের। কোনো পক্ষপাত বা অসূয়া নয়। সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। পরবর্তী প্রজন্মের এসব কথাও জানা দরকার। আমার এসব বিশ্বাস ও মন্তব্য ভ্রান্ত কি না তা ইতিহাসই বিচার করবে। তাছাড়া এসব ঘটনা-দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত কবি লেখকরা তো আছেই, তারাও নিশ্চয়ই সততার সঙ্গে প্রতিবাদ বা সমর্থন জানাবে এই আশা আছে।

॥ তিন ॥

এই সবের পর ১৯৬২-র কোনো এক সন্ধ্যায় কেশব সেন স্ট্রীটে অমৃত পত্রিকার কর্মী, ষাটের লেখকদের অন্যতম সুহৃদ কমল চৌধুরীর বাড়ির ছাদে মুড়ি তেলেভাজা খেতে-খেতে একটা আলোচনা সভা হল। যতদূর মনে পড়ছে এ আড্ডায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ। সভায় স্থির হল— নিজেদের নতুন সাহিত্যরীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ষাটের কবিদের নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে তার জন্য সর্বপ্রথম দরকার নতুন পরিকল্পনায় নতুন পত্রিকা। এই

পত্রিকার রূপরেখা—কী থাকবে কী থাকবে না, কীভাবে প্রকাশিত হবে, পত্রিকার নাম, সম্পাদক, আর্থিক বন্দোবস্ত সবই ওই সভায় প্রাথমিকভাবে স্থির হয়। প্রথম সভায় উপস্থিত সকলেই প্রাথমিক সদস্যরূপে গৃহীত হয়। পরে অবশ্য অনেক যোগ বিয়োগ হয়েছিল। সদস্য চাঁদা মাসিক পাঁচ টাকা ধার্য হয়।

এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি—১৯৬২-র শেষ দিকে একটি ডিমাই সাইজের, আটপাতার নিউজপ্রিন্টে ছাপা বুলেটিনের প্রকাশ। কভার নেই, প্রথম পাতায় ৩৬ পয়েন্টে ছাপা নাম—'এই দশক'। তার নিচে ১০ পয়েন্ট বোল্ড-এ 'তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র'। দাম দশ পয়সা। সম্পাদক—রমানাথ রায়। প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী ১। একটি সম্পাদকীয় ঘোষণা, যাতে নতুন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হবে। ২। পালাক্রমে সদস্যদের একটি কবিতা ও একটি গল্প। ৩। সদস্যদের বিচারে নিরপেক্ষ, উদার আন্দোলনের মতাদর্শের অনুসারী একজন অগ্রজ লেখকের সাহিত্যকৃতির উপর আলোচনা এবং ৪। একটি বিদেশি গ্রন্থের আলোচনা। প্রতি সংখ্যায় এই সব থাকবে ওই আটপাতার আয়তনে।

এই বুলেটিনে সম্পাদকীয় ঘোষণায় পর্যায়ক্রমে পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত জানালেন—তরুণ প্রজন্মের লেখকদের সাহিত্যরচনা ও প্রচারে সহায়তা করার জন্য তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য ও আধুনিক সাহিত্যের পাঠক তৈরি করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। তিরিশের পরবর্তী কবিদের কুড়িয়ে পাওয়া মতবাদ ও গ্রাম্য উত্তেজনা বাদ দিয়ে ষাটের কবিরা নতুন কবিতা লিখতে চায়। ইত্যাদি।

কথা হচ্ছে, স্পষ্টত এসব ঘোষণা ও আন্দোলন মূলত পঞ্চাশের প্রধান তরুণ কবিদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু কী তাদের অপরাধ ? বাণিজ্যিক লেখক হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরাও বিদ্রোহী—প্রায় একই ধরনের গরম-গরম বুলি আর প্রথাহীন লেখা ছাড়ছেন। পত্রিকা করছেন, কফি হাউসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তখনও তাঁরা আজকের অনেক তরুণের মতোই আনন্দবাজারে একটা লেখা ছাপাবার জন্য লাইন করছেন। কর্তাব্যক্তিদের বাড়িতে ইলিশ মাছ নিয়ে ছুটছেন, কেউ ভোরবেলায় জগিং করছেন। সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ক্ষোভ ও আন্দোলন অর্থহীন ও অপ্রত্যাশিত ছিল। সেই সময়ে তাঁদের লেখালেখির মধ্যে একমাত্র প্রতিবাদযোগ্য ব্যাপার ছিল যৌন শব্দের ব্যবহার। বোধহয় শুরু হয়েছিল—'চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয় লাথি মারব পোঁদে' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। পরে যোনি লিঙ্গ সঙ্গম প্রভৃতি শব্দ সহযোগে ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে অজস্র গদ্য পদ্য রচনা তৎকালীন সম্প্রতি, কৃত্তিবাস, ছোটগল্প বা ঈষৎ পরে প্রকাশিত ক্ষুধার্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এসব নিয়ে সে সময় অনেক বিতর্ক হয়েছে। তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র 'এই দশক' ও এই চীৎকৃত আবেগ ও যৌন শব্দের মাত্রাহীন প্রয়োগ নিয়ে পঞ্চাশের বিরুদ্ধতা করেছে। ঠিকই করেছে। কিন্তু এখন এতদিন পরে এই বয়েসে মনে করি এর মধ্যে

কিছু আতিশয্যও ছিল। এর দ্বারা পূর্বকথিত ষাটের লেখকদের একটা অংশের ব্যক্তিগত ক্ষোভই প্রকাশিত হয়েছে। কেননা পঞ্চাশও তখন তরুণ আর বিতর্কিত হয়ে ওঠাই তরুণদের অভীষ্ট। তরুণদের ষাটও সে সময় ওই বিতর্কিত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই অনেক কাণ্ড করেছে যার অনেকগুলিই অনেকে সঙ্গতিহীন ও দৃষ্টি আকর্ষণের স্থূল উপায় বলে মনে করেছিলেন। কবিতায় ছবির ব্যবহার, স্পেস, যতি চিহ্নের বিলোপ বা গল্পে কাহিনীহীনতা, উত্তেজক ও আকর্ষক স্লোগান সবই সস্তা চটক বলে বহুবার নিন্দিত হয়েছে।

তবে এতসব সত্ত্বেও যে কথা বলা দরকার তা হচ্ছে এই বিরোধিতা প্রত্যেক দশকেরই ধর্ম। অগ্রবর্তী দশকগুলিতেও একইভাবে—তিরিশের বিরুদ্ধে চল্লিশ, চল্লিশের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ প্রচার করেছে। ষাটের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি উপাদান থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, ওই সময়ের সৃষ্টিশীল তরুণ লেখকরা আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন, 'এই দশক' বুলেটিনের মধ্য দিয়ে সেটাই পাওয়া গেল। এই প্রকাশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র ষাট ও তার পরবর্তী দশকের বেশ কিছুকাল ক্রিয়াশীল ছিল এ-ব্যাপারে তর্কের কোনো অবকাশ নেই।

যাই হোক, ঘোষণা ছাড়া বুলেটিনে ষাটের সদস্যদের গল্প বা কবিতা ছাপার কথা ছিল। কবিতা পবিত্র ও অনন্তর ছাপা হয়েছিল। অনন্ত দাশ অনেক পরে 'এই দশক'-এ সদস্যরূপে গৃহীত হয়। গল্প ছিল একটিই—রমানাথ রায়ের। অগ্রজ লেখকদের ওপর আলোচনার প্রথম সংখ্যাতেই আমার লেখা শঙ্খ ঘোষের ওপর ছাপা হয়। এর পরের সংখ্যায় রমা লেখে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর তার পরে দেবেশ রায়ের ওপর বোধ হয় সুব্রত বা শুক্কর। দীপেনদার ওপর লেখার সময় রমা সহসাই লিখে ফেলল—'তাঁর (দীপেন্দ্রনাথের) লেখায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতো অশিক্ষিত চালাকি নেই।' এর ফলে পঞ্চাশের লেখকদের সঙ্গে ষাটের বিরোধ প্রকাশ্যে এল। এবং ঘটনাচক্রে আমিও সেই বিরোধে জড়িয়ে পড়লাম। আমি তখন সম্প্রতি পত্রিকা প্রকাশ করি। এখানে পঞ্চাশ ও ষাট উভয় দশকের তরুণ লেখকরাই আগ্রহের সঙ্গে লেখেন। আমি মনে করি গ্রহণ-বর্জন পাঠকের ব্যাপার। সাহিত্য গুণান্বিত যে কোনো শিবিরের লেখাই প্রকাশ করা সম্পাদকের কাজ। সে সময় পবিত্র আমাকে বলত তুই আর আমিই এখন বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য কবি। পঞ্চাশ আমাদের শত্রু। তোর কাগজে ওদের লেখা থাকলে খারাপ। বন্ধ কর। আমি জানিয়ে দিলাম, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র প্রমুখ ফতোয়া জারি করল—ষাটের কোনো লেখক যেন সম্প্রতিতে না লেখে। এদিকে পঞ্চাশের সমরেন্দ্র সেনগুপ্তও সম্প্রতিতে লেখা দিতে অস্বীকার করলেন রমার ওই লেখার প্রতিবাদে। উভয় শিবিরেরই বিরাগ ভাজন হলাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলেই লেখা দিয়েছে। এমনকি রমানাথ রায় বা পবিত্রও। কিন্তু সম্পর্কটা খুব তিক্ত হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত আমি এই দশক বুলেটিনের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করলাম।

বুলেটিনে একটা পাতা ছিল বিদেশি সাহিত্যের আলোচনার জন্যে। এই পাতায় একবার দ্বিতীয় কি তৃতীয় সংখ্যায় আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল। কেউ জানে না। কিন্তু সবই তো জানানো দরকার। কথাটা এই, বিদেশি সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ পড়াশুনা বা জ্ঞানগম্যি কোনোকালেই আমার ছিল না। ওই বিষয়ে লিখতে বলায় স্বভাবতই আমি আমার অসম্মতি ও অক্ষমতা জানাই। পরে রমা বলল, তুই লেখ, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। লাইট হাউসের কাছে কোনো বইওলার কাছে—টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্টের চলতি একটা সংখ্যা কিনে রিভিউ অংশটা দেখিয়ে বলল—'এটা স্রেফ অনুবাদ করে দে। আমাদের পাঠকদের সব চিনি। কোনো শালা কিছু পড়ে না। তাদের তবু কিছু জানা হবে, আমাদের কাগজের নাম হবে। ঝামেলার কিছু নেই।' রমা বরাবরই এসব ব্যাপারে গুরু। আমি ওর নির্দেশ পালন করলাম। কাজটা বোধহয় বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। লেখাটার সবাই প্রশংসাও করল। আমাদের তৎকালীন মাস্টারমশাই অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজ পড়ার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লেখাটা তোমাদের মধ্যে কে লিখেছে?' আমি সসঙ্কোচে চুরি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বললাম—'আমাদেরই এক বন্ধু'। উনি স্পষ্ট করে বললেন, 'এ লেখকের নামই আমি জানি না। তার ওপর এ বয়সের একটা ছেলে এভাবে আলোচনা করেছে ভাবাই যায় না। একদিন তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো তো।' বস্তুত সাপ্লিমেন্টের সমালোচকই জানিয়ে দিয়েছেন উনি ফরাসি ভাষা থেকে সরাসরি আলোচনা করছেন কারণ তখনও ওই দুটি উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ হয়নি। ভারতে সে বই আসার তাই প্রশ্ন নেই। কারণ লেখকও তখন নেহাৎ তরুণ। তাছাড়া আমার অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে কিছু দেশজ উপন্যাসের ব্যবহারও এটাকে একটা মৌলিক রূপ দেয়। যেমন—ফিলিপ সোলার (পরে এঁর কবিতাও পড়েছি। এমন কিছু আহামরি নয়।)-এর আলোচনায় সমালোচক বলেছিলেন—'লেখাটিতে লেখকের পরিকল্পনা খুব প্রকট। নৌকাডুবিতে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন বেশ মজার, রূপকথার মতো।' আমি জুড়ে দিলাম,—যেন শকুন্তলার শিক্ষিত আংটির মতো। ঠিক সময়ে মাছের পেট থেকে রাজার হাতে এসে মিলন ঘটিয়ে দেয়। এই ছিল ষাটের প্রথম সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা অংশের কথা।

॥ চার ॥

'এই দশক' বুলেটিন আকারে পর পর ন'টি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশে তৎকালীন লেখক ও পাঠক সমাজে—বিশেষত তরুণদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে এবং এর প্রভাবে নতুন গল্প ও কবিতার একটি ধারা তৈরি হয়। পূর্বোক্ত উদ্যোক্তারা ছাড়াও বেশ কিছু তরুণ এই নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন রচনারীতিতে লেখা শুরু করেন। এঁদের কেউ কেউ পরে অল্প-বিস্তর পরিচিতিও পান। এ প্রসঙ্গে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চন্দ, শেখর বসু, বলরাম বসাক বা সুনীল জানার নাম করা যায়। 'এই দশক' বুলেটিনের পরই এঁদের লেখক জীবন শুরু হয়েছে বলা যায়।

১৯৬৪তে বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পরেই ১৯৬৫তে একই ('এই দশক') নামে একটি গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী 'এই দশক' বুলেটিনের সদস্য ছিলেন এবং বুলেটিনে প্রকাশিত ঘোষণাগুলিই এখানে দেখা গেল। সুতরাং এই দশক গল্পের পত্রিকাকে এই দশক বুলেটিনেরই সূতিকা-গৃহে প্রসূত বললে ভুল হবে না যদিও ক্রমশ নতুন সদস্যদের আগমন, বিতর্ক সৃষ্টি ও রচনারীতির চমৎকারিত্বের দ্বারা পরবর্তীকালে এটি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। এই দশক পত্রিকার জন্মসূত্রের সন্ধানে 'এই দশক' বুলেটিন ছাড়াও অবশ্য 'বিদিশা' নামের গল্পপত্রের নাম করতেই হবে। ফসল, মহেঞ্জোদারো, সম্প্রতির মতো পাঁচ-মিশেলি সাহিত্যপত্র ছাড়া সে সময় শুধুমাত্র গল্পের কাগজ দুটিই ছিল। বিদিশা ও ছোটগল্প। এর মধ্যে ছোটগল্প পত্রিকায় কালেভদ্রে দু-একটি এই লেখকদের লেখা ছাপা হলেও এটি মূলত চরিত্রে ছিল পঞ্চাশেরই অনুগামী। ফসলও প্রায় তাই। ষাটের নতুন লেখকদের পরীক্ষামূলক গল্প বেশিরভাগ বিদিশা ও সম্প্রতিতেই প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে বিদিশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সকলেই—আশিস ঘোষ, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে এই দশক রূপ বুলেটিন হয়ে (ঘুরে / মারফৎ) পত্রিকার আশ্রিত হয়েছে।

কিন্তু বিদিশা বা সম্প্রতি বা এই দশক বুলেটিন এসবের থেকে এই দশক পত্রিকার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য হল, এখানেই প্রথম শুধু গল্প নিয়ে একটা তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক আন্দোলন শুরু হল ঘোষিতভাবে একটি নির্দিষ্ট নামে, প্রথম সংকলনের ঘোষণাই ছিল—"এটি শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের এবং সমকালীন সাহিত্যান্দোলনের মুখপত্র" এই প্রথম ঘোষণার মধ্যেই পাওয়া গেল দুটি শব্দ ১। শাস্ত্রবিরোধী, ২। সাহিত্যান্দোলন। বস্তুত পরবর্তীকালে এই সম্পূর্ণ উদ্যোগই শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন রূপে পরিচিত হয়েছে। প্রথম থেকেই রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন প্রমুখ ছিলেন। ক্রমশ দু-এক সংখ্যার ব্যবধানে অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানা যোগ দিলেন। এই আট শাস্ত্রবিরোধী লেখক—অষ্ট বসু, এঁরা অষ্ট ধাতুতে গড়া। পত্রিকায় যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা ও কড়া কড়া স্লোগান ছাড়া হয়েছে সেগুলির রচনা প্রযোজনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে প্রধানত ছিলেন—রমানাথ, সুব্রত ও অমল। অন্যান্যরা ঘটনাচক্রে এই চক্করে পড়ে গিয়েছিলেন বা সময় সুযোগ বুঝে ভিড়ে গিয়েছিলেন বলা যায়। অন্তত আন্দোলনের কোনো চিহ্ন এঁদের লেখায় ছিল না। এঁরা এসেছিলেন কেউ বন্ধুত্ব ও দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে কেউ আন্দোলন প্রসারের প্রয়োজনে কেউ বা সম্ভাব্য বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক হিসেবে। এই বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক লেখকটি কিন্তু নির্বাচকদের প্রত্যাশা একেবারেই পূরণ করতে পারেননি। তাঁরা বন্ধুদের কাছে একান্তে বহুবারই আক্ষেপ করেছেন। সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছি আমিই, কারণ আমার সূত্রেই ওই লেখকের এই দশক বা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। সম্প্রতি পত্রিকার একটি সংখ্যায় তাঁর সাহায্যে প্রচুর

প্রায় আশাতীত বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়। এই ঘটনাই তৎকালীন এই দশকের লেখকদের ভ্রান্তির কারণ। এ'রা বিশেষত রমানাথ প্রায়ই অনুযোগ করেছে—কি মালই বাজারে ছেড়েছিস! শালা লিখতেও জানে না, বিজ্ঞাপনও এল না ওটাকে নেয়াটাই ভুল হয়েছে।

১৯৬৫ থেকে '৭৬ এই বারো বছরে মোট বাইশটি সঙ্কলনের পর এই দশক শাস্ত্রবিরোধী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যেই এই আন্দোলন নানাভাবে সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল নিঃসন্দেহে। প্রথম প্রকাশ থেকেই নানা উত্তেজক স্লোগান বা ঘোষণা দিয়ে সাহিত্যের বাজার বা বাগান তছনছ করতে জানান দিয়ে প্রবেশ করলেন শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা। তাঁরা বললেন— ১। গল্পে যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে। ২। গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব। ৩। আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত। অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।

এই সব এবং আরো অনেক ঘোষণা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাওয়ার ফলে আন্দোলন আরো ঘন এবং প্রচারিত হতে থাকে। সাধারণ্যে বিশেষত তরুণ লেখকদের মধ্যে এই সব স্লোগান এবং প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমার বিবেচনায় শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন প্রস্তাবনা, চরিত্র এবং প্রতিক্রিয়ায় বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সার্থকতম সাহিত্য আন্দোলন।

এই আন্দোলন ও এ'দের আদর্শ, প্রস্তাব বা রচনা ইত্যাদি নিয়ে অনেক বিবাদ বিতর্ক ও প্রশ্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এ'রা প্রায়শ লেখার মধ্যেই স্ববিরোধী উক্তি করেন, একই লেখক ভিন্ন লেখায় ভিন্ন-ভিন্ন উক্তি করেন। এক সদস্য অন্যের বিরোধিতা করেন এই সব উল্টোপাল্টা উক্তি ও ঘটনা পাঠকদের বিরক্ত ও বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের পক্ষে যা ক্ষতিকর। ইতিমধ্যে ১৯৭০-৭২ এর মধ্যে কোনো সময়ে এই দশকের অন্যতম সদস্য বলরাম বসাক প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করল। বলরাম তখন দৈনিক আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে প্রায় নিয়মিত লিখছে। সাময়িক কিছু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রায় সহসা অনায়াসে এসে গেছে। বিপ্লবের আর প্রয়োজন নেই অথবা শাস্ত্রবিরোধী ছাপ এই প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন চিন্তা হয়তো বলরামকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু অচিরেই আনন্দবাজারে পরিত্যক্ত ও এই দশকে নিন্দিত বলরাম প্রায় স্তব্ধ ও বিস্মৃত হয়ে গেল।

কিন্তু সদ্য তরুণ এই লেখকদের ওই সব উদ্ভট ও অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও এই আন্দোলনের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আছে। যেমন—এদের প্রস্তাবিত নতুন ধারার গল্পের বেশ কিছু পাঠক তৈরি হয়েছে। কেননা ওই সব লেখকদের বইয়ের বিক্রি এখন খুব নগণ্য নয়। এ ছাড়া এই রচনারীতির দ্বারা ক্রমশ পরবর্তীকালের লেখকদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। আশিস মুখোপাধ্যায়, তাপস চৌধুরী,

মনোজ চাকলাদার, চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর বন্দী, অমল দত্ত প্রমুখ লেখকের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। এরা পরবর্তীকালে সাতের দশকে শাস্ত্রবিরোধীর বিকল্প ও প্রায় পরিপূরক একটি আন্দোলন নিজেরাই সংগঠিত করেছিল। অবশ্য এই আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকা বা এদের শরিকদের ঘনিষ্ঠ সাহায্যের জন্য গর্বিত এই লেখক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য সবিশেষ লজ্জিতও বটে। তার কিছু উল্লেখ না থাকলে ইতিহাসধর্মী এই আলোচনায় সম্পূর্ণতা আসে না। তাই এসব প্রসঙ্গ।

।। পাঁচ ।।

১৯৭৬ সাল নাগাদ এই দশক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। তা যেতেই পারে। একটা বিশেষ বয়েসের পর উত্তেজনা কমে আসে, পত্রিকা বন্ধ হয়। এসব ঘটনা সব সময়ই হয়। এক্ষেত্রে এগারো-বারো বছর সময় বা বাইশটা সংকলনের প্রকাশই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল ঠিক এর অব্যবহিত আগেই এই গোষ্ঠীর মুখ্য বিপ্লবী লেখকদের আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে দেশ পত্রিকায় ও ১৯৭৫-৭৬ থেকে আনন্দবাজার দৈনিক ও পূজা সংখ্যায় এই গোষ্ঠীর রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ ও শেখর বসু প্রমুখের লেখা প্রকাশ শুরু হয়। আর ১৯৭৬ সালেই এই দশকের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এই ঘটনায় শাস্ত্রবিরোধী গোষ্ঠীর বাইরে যে লেখকদের স্লোগান-বিদ্ধ করে তাঁদের প্রাচীন ও অলেখক প্রতিপন্ন করার জন্য এরা এতকাল আন্দোলন করেছিল তাঁরা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলতে পারেন—এই বিপ্লব, স্লোগান, ভাঙচুর, এতসব ধানাই-পানাই গোলাগুলি সবই কি তা হলে ওই বাণিজ্যিক কাগজে নিজেদের জায়গা করে নেয়ার জন্যেই! বিশেষত বলরাম কয়েক বছর আগেই একইভাবে আনন্দবাজারের প্রভাবে দলত্যাগ করায় অবশিষ্টরা একই রকম মন্তব্য করেছে। বিরোধীদের এইসব প্রশ্নকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং সে ইচ্ছাও বর্তমান লেখকের নেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়েছে।

তবে এটাও বোধ হয় ঠিক, এই শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের একটা অংশ, অন্তত, রমা, সুব্রত ও অমল কখনো প্রকৃত অর্থে স্বধর্মচ্যুত হয়নি নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও। বাণিজ্যিক কাগজের সঙ্গে কিছু সমঝোতা করেও এরা (অমল বাদে) আন্তরিকভাবে নতুন রচনাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। অমল, এদের মধ্যে কোনোদিনই বাণিজ্যিক কাগজে লেখেনি। কারণ সে যোগ্যতাও ওর ছিল না। গল্পের তো ওই ছিরি! না সাবজেক্ট না প্রেডিকেট। উপন্যাসের নায়ক চৌবাচ্চা থেকে গোরুর মতো জল খায়। তাছাড়া লেখকেরও ব্যক্তিত্ব বা বুদ্ধিসুদ্ধি কিস্যু নেই। বোধহয়, ৭০-৭২ সালেই ময়দানে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, ছোট গল্প আলোচনার এক মঞ্চে সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উদ্দেশ্য করে অমল অনেক অপমানসূচক ও বিপ্লবাত্মক কথা বলে

পরে আবার আহ্বায়ক বিমল করের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখল।—এটাই সম্ভবত অমলের চরিত্রে একমাত্র কালো দাগ হয়ে আছে। এটা ছাড়া অমল কখনোই বাণিজ্যিক সাহিত্য ও তার প্রতিনিধিদের ধারে কাছে যায়নি। লিখতও চমৎকার, লেখক পাঠক কারোর তোয়াক্কা করত না। পরবর্তীকালে ও নিজেই অন্যতর একটা সাহিত্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত অমল এখন মুমূর্ষু। বহু বিলম্বিত জীবনসুধা পানে ও এখন অবশ ও অচেতন। লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ওর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা এখন অর্থহীন। প্রায় বছর পাঁচেক ও পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।

রমানাথ রায় অমলের মতো ব্রহ্মচারী নয়। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা বা অর্থের আকর্ষণ তার ষোল আনাই আছে। ঠিক সময়ে আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক বিপ্লবী বুলি বন্ধ করে বাণিজ্যিক বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রমা তার রচনায় অন্তত বাণিজ্যিক রচনার রীতিনীতি কখনোই অঙ্গীকার করেনি, একথা অনস্বীকার্য। বাণিজ্যিক পত্রিকার পক্ষেও গ্রহণীয় কিন্তু রমারও সহজাত (দীর্ঘদিন রমার লেখার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য জানি) কৌতুকপ্রিয়তার পৌনঃপুনিক ব্যবহার ছাড়া রমা বড় কাগজেও ধারাবাহিক ভাবে নিজস্ব রচনা ও উচ্চারণের চর্চাই করেছে। কাগজ, বাণিজ্যিক বড় কাগজে তার প্রতিষ্ঠা তেমন দৃঢ় হয়নি বটে কিন্তু এই রীতি কিছু প্রচার পেয়েছে এবং সেই সুবাদে কিছু নতুন পাঠক সমাজও গড়ে উঠেছে। বস্তুত ছোট বড় কাগজ মিলিয়ে রমাই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের রীতি ও আদর্শকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বেঁধে রাখতে পেরেছে।

রমানাথের সঙ্গে সুব্রত সেনগুপ্তর অনেক ব্যাপারেই মিল আছে। সেই বিদিশা প্রকল্পের সময় থেকেই সুব্রত কট্টর শাস্ত্রবিরোধী। লেখায় স্লোগানে সর্ব ব্যাপারেই সুব্রত নিজের স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরতে জানে। এই দশক সাহিত্য পত্রিকার পাঠশালা বন্ধ করে বাণিজ্যিক কাগজের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর প্রথম কিছুদিন সুব্রতর লেখায় প্রায় বাণিজ্যিক লেখার মতোই ধরাবাঁধা রাস্তা ও যৌনতার প্রকোপ দেখা দেয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই পীড়িত বোধ করেছি। আমার ক্ষোভের কথা একটি পত্রিকায় প্রকাশও করেছি। কিন্তু দু-তিন বছর আগে আজকাল পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সুব্রতর পর-পর দুটি উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছে—প্রয়োজনে সুব্রত ঠিক সময়ে ঘুরে দাঁড়াতে জানে। এই লেখকের কাছে এখনও আমাদের বেশ কিছু পাওয়ার আছে।

অবশিষ্ট শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের মধ্যে কল্যাণ সেন, সুনীল জানা ও বলরাম বসাকের লেখা দীর্ঘদিন বন্ধ। বাকি যাঁরা প্রধানত বাণিজ্যিক কাগজে আধা বাণিজ্যিক লেখায় মাঝে-মাঝে গত জন্মের বিপ্লবীয়ানার চোঁয়া ঢেকুর তুলছেন তাঁদের লেখায় শাস্ত্র-বিরোধিতার চিহ্ন খোঁজা পণ্ডশ্রম।

॥ ছয় ॥

১৯৬৪ সালে 'এই দশক' বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর ১৯৬৫তে এই দশক গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেকথা এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে। আগের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে, 'এই দশক' বুলেটিনের উদ্যোক্তা ও লেখকসঙ্ঘ যৌথভাবে গল্প ও কবিতা লিখিয়েদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আর ঠিক এই সময়েই ষাটের দ্বিতীয় সার্থক আন্দোলন—'শ্রুতি' কবিতাপত্রকে ঘিরে শুরু হয়। কবিতা লিখিয়েদের মধ্যে বর্তমান লেখক—অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৬২ সালেই বুলেটিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যাপারটা হল—পূর্বে উল্লেখিত পবিত্র আর রমার সঙ্গে পঞ্চাশের কিছু লেখক ও কবির সেই পুরনো গণ্ডগোল। একটা ব্যাপার সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেখছি—তুখোড় রাজনীতিক বা ঝানু ব্যবসায়ীর কায়দাতে কিছু লেখক শিল্পীও তাঁদের ব্যক্তিগত যে কোনো সমস্যাকে গোষ্ঠী বা সমষ্টির সঙ্গে স্বেচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে ফেলেন—'এটা শুধু আমারই বিপদ নয়, দলের সকলের বিপদ। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে একে প্রতিহত করতে হবে।'—এমন একটা ধারণা এঁরা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চান। অধিকাংশ সময়ই এই পদ্ধতি বেশ কাজ দেয়। এক সময় বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে ওই দলের কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে একটা লেখা লিখেছিলেন। ওই পদ্ধতিতেই নানা চেষ্টায় সে লেখার প্রকাশ বন্ধ করা হয়। একবার প্রাক্তন শাস্ত্রবিরোধী এক সদস্য আনন্দবাজারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। সেবারও তিনি কিছু সহকর্মীকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে এটা তাঁদের সকলের অপমান। অবশ্য সেক্ষেত্রে ওই লেখকের সঙ্গে তাঁদেরও ভরাডুবি হয়েছিল। বর্তমান লেখাটিও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে বিবেচিত হলে বিস্মিত হব না। তবে এ সবের শুরু ওই বুলেটিনের সময়েই যখন রমানাথ ও পবিত্রর সঙ্গে পঞ্চাশের শক্তি ও সন্দীপনের ব্যক্তিগত বিরোধকে ষাটের বিরুদ্ধে পঞ্চাশের অবজ্ঞা ও অপমান বলে প্রচার করা হয়।

যাই হোক, তারপর বছর দুয়েক চলার পর সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে আমি এই দশক বুলেটিনে লেখা দেয়া বন্ধ করলাম এবং সাহিত্যক্ষেত্র থেকেই প্রায় নিষ্ক্রমণ করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। বর্তমান আলোচনার পটভূমি ও বাস্তবতার অনুধাবন এবং এইসব উদ্যোগে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ও বিতর্কের ব্যাখ্যার চেষ্টাতেই এইসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপস্থাপনা। সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকা উচিত বলে মনে করি। ১৯৬৪ সালে বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধের পর প্রায় বছর দুই সম্প্রতি ও আমি ছিলাম। তারপরই নানা কারণে ১৯৬৫-৬৬ নাগাদ সমাপ্তি ও প্রস্থান।

ঠিক এই সময়েই ৬৪-৬৫ নাগাদ ষাটের দ্বিতীয় সার্থক কাব্যান্দোলন—'শ্রুতি'র সূত্রপাত হয়। এই দশকের প্রায় একই ঢংয়ে স্লোগান, বিবৃতি ও ঘোষণা সহযোগে 'শ্রুতি' কবিতা আন্দোলন ও কবিতায় নতুন যুগের সূচনার অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ

করে। ঘোষণাগুলির অধিকাংশই এই দশক বুলেটিনে পূর্বেই প্রকাশিত। যেমন— কবিতায় রাজনীতি প্রচারিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান নেই। কবিতার কোনো রকম ব্যাখ্যা বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব নেই। ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা। সমস্ত প্রথার শাসন ছিন্ন করে সংস্কারের বন্ধন ভেঙে কবিতাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ। কারিগরী নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি। বুদ্ধির চমক নয়, ব্যাকুল সন্ন্যাস। ব্যক্তিগত জগৎ সৃষ্টির জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনা-রীতি ও উচ্চারণ ; এ ছাড়াও ব্যাকরণের বিরোধিতা, প্রচলিত ছন্দের বর্জন, ছেদচিহ্নের বিলোপ। নতুন ধরনের মুদ্রণের বিন্যাসে কবিতার দৃশ্য ও শ্রাব্যরূপের প্রকাশ ইত্যাদি। বাংলা কবিতা এখন আন্তর্জাতিক, সুতরাং সমকালীন বিদেশি কাব্যান্দোলন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এই সব প্রচার ঘোষণা ও কবিতায় তার রূপায়ণ ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরে প্রকাশিত দশটি সংখ্যায় শ্রুতি পত্রিকার পাতায় দেখা যাবে বিভিন্ন নামে টুকরো-টুকরোভাবে, কখনও আলাদা নিবন্ধ আকারে। পত্রিকা ১/৮ ডিমাই সাইজে দশ পয়েন্টে-ছাপা, অধিকাংশই নিউজপ্রিন্টে। মূল্য ৫০ পয়সা। কিন্তু বিনামূল্যেই বিতরিত হত। লিটল ম্যাগাজিন হয়তো এখন কিছু বিক্রি বাটা হয়। কিন্তু তখন অধিকাংশ কাগজই—এই দশক বুলেটিন, পত্রিকা, শ্রুতি, হাংরি, সম্প্রতি, ঈগল, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো সবই প্রকাশিত হত প্রধানত, সদস্যদের চাঁদা বা সম্পাদকের টাকায় এবং যৎসামান্য বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্যে এবং বিতরিত হত বিনামূল্যে। ক্বচিৎ স্টলে কিছু কাগজ দিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাকা বা কাগজও ফেরত পাওয়া যেত না।

শ্রুতি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছিল—পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী ও অনন্ত দাশ এই পাঁচজন। পরে অনন্ত শ্রুতি ত্যাগ করে। আরো অনেকে—যেমন, রত্নেশ্বর হাজরা, সুকুমার ঘোষ, রথীন ভৌমিক, প্রমুখ কখনও সদস্য হয়ে বা বাইরে থেকে শ্রুতিতে দু-একটি লেখা লিখেছেন। এমন কি অতীন্দ্রিয় পাঠক, রবীন সুর, অভী সেনগুপ্ত বা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দু-চারটি কবিতা শ্রুতির অন্তিম পর্বে দেখা যাবে। কিন্তু এঁরা কেউ শ্রুতি লেখকগোষ্ঠীভুক্ত নয়। শ্রুতির লেখক বলতে পুষ্কর, পরেশ, সজল ও মৃণাল এই চারজনকেই বোঝায়।

শ্রুতি আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ঘোষণা, স্লোগান ইত্যাদি যৌথভাবে প্রকাশিত হলেও এগুলি বেশির ভাগই পুষ্কর দাশগুপ্তর রচনা ও পরিকল্পনা ছিল। যেমন রমানাথ এই দশকের বা মলয় হাংরির বা অমল ছাঁচ ভেঙে ফ্যালোর তেমনি পুষ্করও শ্রুতির প্রধান তাত্ত্বিক নেতা। শ্রুতির মুখ্য লেখকও এই চারজন। যদিও পুষ্করের মৌলিক লেখার চেয়ে ভাষণ ও প্রচারই বেশি ছাপা হয়েছে। আন্দোলনের তাত্ত্বিকতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই পুষ্করের কিছু আকর্ষণীয় কবিতাও সে সময়ে বেরিয়েছে, তবে তা সংখ্যায়

খুবই কম। পরেশ, মৃণাল ও সজল—বিশেষত পরেশ বাংলা কবিতাকে প্রায় পুনর্গঠন করল শ্রুতির পাতায়। পুষ্করের ঘোষণা ছিল, কবিতা—ছবি ও সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরেশের কবিতার ছবি ও ছবির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক স্পষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সজলের কবিতায় তেমনি সুর ও গান—অক্ষর ও স্তবক বিন্যাসে ছবিরও আভাস আছে। আর মৃণাল ছন্দের ব্যবহারে স্তবক বিন্যাসে, কবিতা ভাষার ব্যবহারে শ্রুতির দর্শন ও অনুশাসনে প্রাণিত ও প্রয়োগে সার্থক কবি হয়েও শ্রুতি সঙ্ঘে সর্বাধিক সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে মৃণালের উদ্যোগেই শ্রুতির প্রকাশ ১০ম সংখ্যা (মার্চ / ১৯৬৯) পর্যন্ত মসৃণভাবে ঘটেছে। তারপরও যখন শ্রুতি পরিষদ অবসন্ন, প্রায় মুমূর্ষু মৃণালই একক উদ্যোগে একাদশ থেকে চতুর্দশ (১৯৭০-৭১) চারিটি সংখ্যা প্রকাশ করে শ্রুতির পুনর্জীবনের জন্য শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করে।

সমমনস্ক লেখকদের নিয়ে কোনো রকমে পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য মৃণাল তখন উদগ্রীব। সেই সূত্রেই ওই সব কবিদের—অশোক, অতীন্দ্রিয়, অভী বা রবীনের শ্রুতিতে প্রবেশ ও প্রকাশ। ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্প্রতি বন্ধু উত্তম দাশের হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখে মনে পড়ল। শ্রুতি তখন, ১৯৬৯ এর দশম সংখ্যার পর প্রকৃত প্রস্তাবে ভেঙেই গেছে। শ্রুতির প্রাণপুরুষ পুষ্কর এরপর আর শ্রুতিতে লেখেনি। পুষ্করের কাজই হচ্ছে, প্রবল উৎসাহে কোনো কাজ শুরু করা এবং কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে সতীর্থদের ডুবিয়ে বিদায় নেয়া। শ্রুতি, কালক্রম প্রভৃতির প্রকাশ ও প্রয়াণের ব্যাপারে পুষ্কর একাধিকবার ওর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

১৯৬৩-র পর আমি লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। ৬৩ থেকে ৬৮ ছ-বছরে মাত্র দুটি লেখা অমৃত পত্রিকায় বেরিয়েছে। সুতরাং ওই সময়ে, শ্রুতির প্রকাশ কালে শ্রুতিতে লেখার কোনো প্রশ্নই আসে না। ১৯৬৯ এ কবিতায় আমার পুনঃপ্রবেশ ঘটে। লেখা বন্ধ থাকাকালীন দূর থেকে সব লক্ষ করতাম। কবিতা ও কবি বন্ধুদের সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল মাত্র। নতুন করে লেখা শুরু করে দেখলাম উপস্থিত কবিতা ও অধিকাংশ কবি আমার অপরিচিত। অবশ্য পুরনো বন্ধুদের মধ্যে পরেশ সজল ও মৃণাল তখনও সক্রিয়। দীর্ঘদিন পরে আমার ভেসে ওঠার পরই পুষ্কর ও তৎকালীন বহ্নিশিখা সম্পাদক উত্তম দাশ ডুব দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশ, সজল ও মৃণালও ডুব দেবে তখনও জানতাম না। এখন মনে পড়ছে ঠিক সেই সময়েই ১৯৭০ এ মৃণাল আমার কাছে শ্রুতির জন্যে কবিতা চায় সঙ্গে পনের টাকা চাঁদা। দীর্ঘ চর্চাহীনতা ও জড়তার পর সদ্য লেখা শুরু করেছি। অবশ্য লেখা বন্ধ থাকলেও শ্রুতির খবরাখবর ও লেখন রীতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবু সে সময় আমি খুবই অস্ফুট ও অপটুভাবে শ্রুতির রচনাদর্শকে প্রায় অনুকরণ করে কিছু লিখেছি পর পর দু-তিনটি সংখ্যায় ; এখন সেসব লেখার জন্য আমি লজ্জিত। বস্তুত

শ্রুতি আন্দোলনের চূড়ান্ত সময়ে আমি অনুপস্থিত থাকলেও এর দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু তার জন্যই আমি শ্রুতি আন্দোলনে ছিলাম এমন দাবি করা যায় না। এক সময় আলোক সরকারের এই উল্লেখে আমি একটি পত্রিকায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছি, এখন উত্তমের উল্লেখেরও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি, অতীন্দ্রিয়, রথীন, কালীকৃষ্ণ বা রবীন আমরা কেউ শ্রুতি গোষ্ঠীর নই, এটা ঐতিহাসিক সত্য।

এই আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, অন্তত, শ্রুতির ঘোষণাবলীতে যা প্রকাশিত তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকদের মতোই শ্রুতি গোষ্ঠীর কবিরাও প্রথম থেকেই কবিতার প্রচলিত স্রোত থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে চেয়েছেন। কারণ স্বাতন্ত্র্য ছাড়া নতুন কবিদের কোনো উপযোগিতাই নেই। এ-ভাবেই মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তারপর জীবনানন্দের প্রবেশ ঘটে বাংলা কবিতায়। জীবনানন্দের পরও বিভিন্ন পর্বে কবিরা স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়েই স্মরণীয় হয়েছেন। তাই পঞ্চাশের প্রচলিত ধারা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নিতে তাঁরা ঘোষিত ও পরিকল্পিত-ভাবে কবিতায় নানারকম রীতির উপস্থাপনা দ্বারা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। প্রথম থেকেই এঁরা বুঝেছিলেন, বুলেটিনে বা পরে এই দশক বা শ্রুতির ঘোষণাতেও ছিল রীতির ওপর গুরুত্ব—"কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস।" কেন না বিষয় নিয়ে নতুন বিশেষ কিছু করার নেই। শোক দুঃখ প্রেম আনন্দ আবেগ—এ সবই ছিল আছে থাকবে। শুধু প্রকাশটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এই প্রকাশ রীতিরই চর্চা দেখা গেল শ্রুতিগোষ্ঠীতে, এই চর্চায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে এল নানা প্রক্রিয়া। এতদিন কবিতার অন্তরঙ্গ বিষয় হিসেবে ছিল, প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, মানুষের জৈব ধর্ম প্রভৃতি। এবং বহিরঙ্গের ব্যাপারে ছন্দ অলঙ্কার, মিল অমিল নিয়ে কিছু কথা ও কাজ হয়েছে। তিরিশ ও চল্লিশের কবিরা প্রধানত অক্ষরবৃত্তকেই পছন্দ করলেও পাশাপাশি চার মাত্রার হালকাচালে গম্ভীর বক্তব্যকেও উপস্থাপনা করার চর্চা করেছেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে চর্চিত গদ্য ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার ও চর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল। পঞ্চাশের কবিতায় এই সব ও সেই সঙ্গে পয়ারেরই পরিবর্তিত সনেটকল্প ষোড়শপদী নামে এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ কবিতার খুবই প্রচলন হয়েছিল।

শ্রুতির কবিরা বাংলা কবিতার উপরি উক্ত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় দিকে নতুন কণ্ঠস্বর ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ঘোষিত ভাবে প্রবেশ করলেন। পূর্বালোচিত শ্রুতির ঘোষণাগুলি থেকে এঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে।

পঞ্চাশের কবিতার চিৎকৃত আবেগী উচ্চারণের বিরুদ্ধে শান্ত স্থিতধী অন্তর্মুখী কবিতা শ্রুতির কবিরা অঙ্গীকার করেছিলেন। কোনো বর্ণনা বা দার্শনিকতার ভণ্ডামি নয়, আত্মপ্রচার বা কল্পনাবিলাস নয়, বস্তুর নিজস্ব রূপের ও ধর্মের বাস্তব উপস্থাপনাই তাঁদের অভীষ্ট ছিল। এই বস্তুতান্ত্রিকতার প্রকাশের উপযোগী আঙ্গিকই তাঁদের

প্রয়োজন ছিল। বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় বিদেশি আন্দোলন—কংক্রিট কবিতা ফরাসি দেশে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার খবরাখবর তখনও এদেশে পৌঁছয়নি। শ্রুতির তাত্ত্বিক নেতা, ফরাসি ভাষায় তৎকালীন কৃতী ছাত্র ও বর্তমানে কৃতী অধ্যাপক পুষ্কর দাশগুপ্ত অতীত সাহিত্যের মালার্মে—পাউন্ড এবং এই শতকের প্রথম পাদের অ্যাপলিনেয়র প্রমুখের দৃষ্টান্তে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে নিজের রচনায় প্রকাশ করলেন। শ্রুতির প্রথম সংখ্যাতেই পুষ্করের সূর্যস্তোত্র দিয়ে এর সূত্রপাত। টাইপ সাজিয়ে কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের প্রকাশ। সমসময়ে এসব রচনা প্রবলভাবে সমালোচিত কখনো ধিকৃত হয়েছে। কেউ বলেছে টাইপোগ্রাফি কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছে—'এরা কি আগের জন্মে কম্পোজিটর ছিল!' পুষ্করের প্রধান সহযোগী শ্রুতির অন্যতম স্তম্ভ পরেশ মণ্ডলও বিদেশি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। পরেশ আরো চমকপ্রদভাবে, কখনোও ওই টাইপোগ্রাফি কখনোও ব্লক সহযোগী নতুন নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবন করে শ্রুতির বস্তুতান্ত্রিক কবিতার আদর্শকে রূপায়িত করে নতুনের অনুরাগী নতুন পাঠকসমাজকে সচকিত করে তুলল। ততদিনে ষাটের শেষের দিকে কংক্রিট কবিতার পুরোধা পীয়ের গার্নিয়ের ও তাঁর সহযোগীদের কিছু লেখা—*The Concrete Poetry World View*, বইটি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

সেই সময়ে, দীর্ঘ ছ-বছরের অজ্ঞাতবাস ছেড়ে ১৯৭০ সালের প্রথমে কবিতায় আমার পুনঃপ্রবেশ ঘটেছে। মৃণালের প্রযত্নে শ্রুতির শেষ কয়েক সংখ্যায় কবিতাও ছাপা হয়েছে। তারপর, ১৯৭২-৭৩ নাগাদ আমার ও পরেশের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ঈগল। প্রথম পর্যায়। এই প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা দরকার। আমি দীর্ঘদিন যাবত ঈগল সম্পাদনা করছি একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ঘটনা হল ঈগলের সূত্রপাত সাতের দশকে—এই দশক, শ্রুতি, এক কথায় সেই বুলেটিনের অধিকাংশ সদস্যের সম্মিলিত উদ্যোগে সহযোগিতায় ও অর্থানুকূল্যে। সম্পাদনার দায়িত্বে আমি ও পরেশ ছিলাম সদস্যদেরই নির্বাচনে। কাগজটি প্রায় এই দশক ও শ্রুতির বিকল্প ও পরিপূরক হিসেবেই প্রকাশিত হয়। শ্রুতি প্রসঙ্গে এই আলোচনা তাই বিধেয় মনে করছি। সদস্যদের মধ্যে ছিল রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, অতীন্দ্রিয় পাঠক, তপনলাল ধর, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরেশ ও অশোক তো বটেই। এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল রমার। ঈগল নামটাও ওর দেয়া। আসলে সেই সময়ে লেখা ওর একটা উপন্যাসের ছাপার হরফে প্রকাশ হওয়া দরকার ছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই ছিল—রমার উপন্যাস 'সাক্ষাৎকার' এবং অন্যান্য শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের গল্প ও গ্রন্থ আলোচনা। কবিতায় শ্রুতির পুষ্কর ছাড়া সবাই।

এই ঈগলেই কংক্রিট কবি পীয়ের গার্নিয়েরের একটি রচনা আমি অনুবাদ করি বিশ্বস্তভাবে। (আগের বুলেটিনের অনুবাদের মতো কোনো তঞ্চকতা ছিল না।) তাছাড়া,

শ্রুতিধারায় আমার কিছু কবিতা ও ছেলেমানুষি কাজ। যেমন—ছবি ও কবিতা মিলিয়ে ছবিতা। কখনো ব্লকে কখনো ছোট বড় টাইপ সাজিয়ে একপাতা-দুপাতা জুড়ে সব লেখা। এক সময় আন্তরিকভাবেই এসবে মত্ত ছিলুম। সমর্থনে অনেক গদ্যও লিখেছি। শুধুমাত্র নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা ছাড়া এসবের কোনো মূল্য নেই, একথা এখন অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। শুধু প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে নতুন পথের সন্ধান ছাড়া এসব কাজে সদর্থক কিছুই ছিল না। তবু এই ভুল চর্চা থেকেই পরবর্তী কালের কবিতায় আমি প্রচুর উপকৃত হয়েছি। পাশাপাশি পরেশ সজল অতীন্দ্রিয় তপন তাদের সক্ষমতা নিয়ে ক্রিয়াশীল ছিল—এক কথায় প্রথম পর্যায়ের ঈগলই হয়ে উঠল বিপ্লবী লেখকদের শেষ মঞ্চ। তারপর প্রথমে ধারাবাহিক উপন্যাস শেষ হওয়ার পরই রমা চাঁদা দেয়া বন্ধ করল। ক্রমশ অন্যরাও পত্রিকা ত্যাগ করল, ঈগল বন্ধ হল। এরপর চার পাঁচ বছর পরে ঈগল আবার প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগলের প্রকাশ অতি সাধারণ একটা পত্রিকার মতো। আমি জবরদস্তি করে প্রকাশ করলাম ও চার পাঁচ বছর চালালাম অনেকটা মৃণালের শেষ পর্বের শ্রুতি চালাবার মতোই, অর্থহীন অস্তিত্বরক্ষার একটা শেষ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

॥ আট ॥

বন্ধু উত্তম দাশের 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' বইয়ে হাংরি বিষয়ে যা পড়লাম তার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কিছু অমিল আছে। আবার পুরো ব্যাপারটায় একটা বিভ্রান্তিও এসে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক স্বার্থেই এসব খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার।

এই দশক, শ্রুতি, ঈগল সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৭ এর জানুয়ারিতে ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হল। ওই সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কৃত্তিবাস মাসিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সদ্য আইয়োয়া ফেরত সুনীল তখন আনন্দবাজারে প্রতিষ্ঠিত। পুরনো নস্টালজিয়া থেকে কৃত্তিবাসকে চালু করলেন। হয়তো ইচ্ছে ছিল, একটা সমান্তরাল আধা বাণিজ্যিক কাগজ করার। প্রথম সংখ্যা থেকে সমরেশ বসুর উপন্যাস এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের লক্ষ্ণীয় আনুকূল্য এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়। সম্পাদনায় স্বয়ং সুনীল এবং তত্ত্বাবধানে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও কিছু ছোকরা কবি লেখক। ওই মাসিকেই সেই সময় হাংরি নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়। প্রথমে সন্দীপনের একটা লেখা পরে তার প্রতিবাদে বাসুদেব দাশগুপ্তর চিঠি। এ ব্যাপারে অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু বক্তব্য ছিল। সেটি লিপিবদ্ধ করে যথাস্থানে পাঠাই। কিন্তু কোনো কারণে সেটি ছাপা হয়নি। একটা ক্ষোভ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগল প্রকাশ করে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (এপ্রিল/১৯৭৭) সম্প্রাতিতে (এপ্রিল/১৯৬২) প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা (যা আমার ধারণা হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে) ও কৃত্তিবাসে অপ্রকাশিত সেই চিঠিটি পাশাপাশি ছাপিয়ে দিলাম। হাংরি

সম্পর্কে আমার প্রাথমিক মনোভাব ওই প্রতিবাদ-পত্রটির মধ্যেই আছে। স্থানাভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মূল রচনাটি বাদ দিয়ে আমার চিঠির প্রয়োজনীয় কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম।

একটি অপ্রকাশিত চিঠি

[......প্রায় বছরখানেক আগে কৃত্তিবাস মাসিক পত্রিকায় পত্রযোগে কিছু বিতর্ক হয় এ-ব্যাপারে অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু বক্তব্য ছিল, পত্রাকারে তা লিপিবদ্ধও হয়েছিল কিন্তু কোনো কারণে সেটি প্রকাশিত হয়নি। সেই চিঠিটি অবিকল (এখানে আংশিক) উদ্ধৃত হল। এখন এই চিঠি কোনো বিশেষ পত্রিকা সম্পাদকের প্রতি নয়, পাঠক সাধারণের প্রতি উদ্দেশিত এই রকম বিবেচনা করাই ভালো।—সম্পাদক]

মাননীয়েষু,

কৃত্তিবাসের বৈশাখ সংখ্যায় হাংরি জেনারেশনের জন্মকথা বিষয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে বাসুদেব দাশগুপ্তর চিঠি পড়লাম। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় অনবধান বশত লিখেছিলেন—

"বোধ হয়তো ১৯৫৮ সালেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' গল্পটি ছাপা হয়েছিল সম্প্রতি নামে তৎকালীন এক ছোট পত্রিকায়। এই গল্পটির নাম থেকেই তথাকথিত হাংরি জেনারেশনের সুরু হয়েছিল।......"

এর জবাবে বাসুদেববাবু লিখেছেন—"মনে হয় সন্দীপনবাবু তাঁর অজ্ঞতা থেকেই এইসব কথা লিখেছেন। এর পর তিনি পাঁচ দফা তথ্য পেশ করেছেন। লিখেছেন—গল্পটির নাম ছিল 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' প্রকাশিত হয়েছিল ছোটগল্প নামক পত্রিকায় ১৯৬৩ সাল-এ। আর মলয় রায়চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৭২-এ। 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' গল্পটি প্রকাশিত হবার আগে নানা ধরনের লেখা দিয়ে হাংরি জেনারেশনের বেশ কিছু লিফলেট ও প্যামফ্লেট বের হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক মাস বাদে ঐসব লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি নামে পত্রিকায় আত্মক্রীড়া নামে গল্পটি লিখেছিলেন। কলমের ডগায় সম্প্রতি পত্রিকার নামটি এসে যাওয়ার কারণ বোধ হয় এই।"

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য নিবেদন করি। হ্যাঁ, ঠিকই, সম্প্রতিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো গল্প প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি তৃতীয় সঙ্কলনে (এপ্রিল / ১৯৬২তে) 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' এই নামে তাঁর দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ওই সঙ্কলনেই পুস্তক সমালোচনা বিভাগে অশ্রুকুমার সিকদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচকদের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিনয়ের 'গায়ত্রীকে' আলোচনায় শক্তি শিরোনাম ব্যবহার করেন—'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব। হাংরি জেনারেশন' ঠিক এভাবেই লেখাটি ছাপা হয়। এর আগের বা পরের কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। কিন্তু মুদ্রিত আকারে হাংরি জেনারেশনের এটাই

প্রথম প্রকাশ এতে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ করবেন শুধু নামকরণেই নয়, আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা ও তাত্ত্বিকতাও এই রচনায় আছে।

এই সঙ্কলন প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কিছু কিছু জল্পনা কল্পনার কথা কানে আসে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো দু-একজনের কাছে শুনি। হাংরি জেনারেশন নামে একটা দল এবং পুরো আন্দোলন চালু হবে—এইসব। এর প্রায় মাসাধিককাল পরে আমার ঠিকানায় ডাকে একগুচ্ছ কাগজ আসে।—হাংরি জেনারেশনের প্রথম ইস্তাহার। সাধারণ হোয়াইট প্রিন্ট কাগজে ডিমাই $\frac{১}{১৬}$ সাইজে ১০ পয়েন্ট ইংরাজি টাইপে ছাপা স্বাক্ষর ও তারিখহীন এই ঘোষণা প্রায় হ্যান্ডবিলের মতোই। হুবহু তুলে দিচ্ছি :—

Satadru Ghosh Lane
Calcutta

Led rebelliously by Shakti Chattopadhyay and creatively named by Malay Roy Chowdhury Hungry Generation is an Indian movement or tendency whose forebearers are Hercules, Grunewald, later Ramkinkar, Kafka, Jibanananda, Garcia Lorca and to some extent Spengler. Absolute Surrealism on the one side and meddledialectics on the other would be logical points of departure from this movement, as its desparate desire is to jump out of the shadow into the sun.

ব্যাস, ছোট গল্পেতে 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' কিংবা সম্প্রতিতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মক্রীড়া'র প্রকাশ এসব অনেক পরের ঘটনা।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এখন এসবের থেকে অনেক দূরবর্তী এবং তিনি পুরোপুরি স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছেন বলেই তাঁর লেখায় হাংরি উদ্ভবের মূল ঘটনা ঠিক থাকলেও তথ্যের কিছু হেরফের হয়ে গেছে। কিন্তু বাসুদেব এমন ভুল করলেন কী করে! তিনি তো মূল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, দরকারি কাগজপত্রও নিশ্চয়ই হাতের কাছে আছে। সম্প্রতিতে ওই ধরনের কোনো লেখাই প্রকাশিত হয়নি এমন ইঙ্গিত তাঁর লেখায় স্পষ্ট। কোনো আন্দোলন বা যে কোনো কিছুই সম্প্রতি বা অন্য কোনো কাগজে শুরু হতেই পারে বা না হতেও পারে, তাতে বেইজ্জত হওয়ার কী আছে! তা গোপন করারই বা কারণ কী?

……যে যাই বলুক, ওই সময়ে ওই সবের বেশ কিছু রচনা বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। দেবী রায়, প্রদীপ চৌধুরী বা শৈলেশ্বরের কবিতা বেরিয়েছিল আলাদা আলাদা ভাবে বুলেটিনের আকারে ইংরাজিতে। বাংলায় মলয় রায়চৌধুরীর আমার অমীমাংসিত শুভা 'বেশ চমকে' দেওয়ার মতো। একটি বুলেটিনে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও অন্য একটিতে বিনয় মজুমদারের কবিতা বেরিয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল, হাংরি উদ্ভবের ব্যাপারে আমার বক্তব্যের পাশাপাশি প্রায় সমান্তরাল আরও কিছু তথ্যের উপস্থাপনা। বাসুদেবের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। উত্তম দাশ তাঁর বইয়ে লিখছেন, সদ্য তরুণ মলয়ের পাটনার বাড়িতে গিন্‌স্‌বার্গের আগমন (১৯৬১), চসারের 'In the sowre hungry time' পংক্তির প্রভাব ও অসওয়াল্ড স্পেংলারের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বিষয়ক কনসেপ্টের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মলয়েরই মাথায় হাংরি জেনারেশনের বীজ প্রথম উপ্ত হয়।

"এই সময়ের প্রতিক্রিয়া দাদার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে জানালেন তিনি। শক্তিও তখন পাটনায়। শক্তি উৎসাহিত হলেন। উৎসাহ দিলেন। কিন্তু শক্তি কলকাতা ফিরেই সম্প্রতি পত্রিকায় লিখলেন 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' মলয়ের পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য। আর সময় নষ্ট সুবিধের মনে হল না তাঁর। দাদার বন্ধু শক্তিকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করে ১৯৬২-র এপ্রিলে বের করলেন 'হাংরি জেনারেশন' তিন কলমে ডবল ক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠার ছাপা বুলেটিন। বর্জাইস টাইপে ছাপা হলো—স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দেবী রায়……"

এখন দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির যে রচনার কথা আগে বলেছি তার উল্লেখ শুধু বাসুদেব ছাড়া সকলের লেখাতেই আছে। কিন্তু রচনার নাম ও কাল সম্পর্কে একজনের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। আর প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কারোর সঙ্গে কারোরই মিল নেই। সন্দীপন বলেছেন **১৯৫৮-তে** শক্তি **'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' গল্পটি** সম্প্রতিতে লেখেন। তার প্রতিবাদে বাসুদেব বলেছেন সম্প্রতিতে নয় শক্তির গল্প ছাপা হয় 'ছোটগল্প'তে—নাম, 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ', সম্প্রতিতে সন্দীপনের 'আত্মক্রীড়া' প্রকাশিত হয়। আবার উত্তমের ভাষ্য অনুযায়ী—মলয় মূল পরিকল্পনার কথা শক্তিকে বলার পর শক্তি কলকাতায় ফিরে সম্প্রতিতে **'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ'**, মলয়ের পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য প্রকাশ করেন। এবং মলয় দাদার বন্ধু শক্তিকে নেতা করে হাংরি জেনারেশন প্রকাশ করলেন **১৯৬২ এপ্রিলে**। এটি—১৯৬২ এপ্রিল শুধু আপত্তিকরই নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ মলয়ই আগে বলেছেন, তাঁর পরিকল্পনা শক্তি সম্প্রতিতে প্রকাশ করার পরই মলয় হাংরি প্রকাশে তৎপর হন। ১৯৬২ এপ্রিলে শক্তি প্রথম হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাব লেখেন। সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই হয়তো যতদূর সম্ভব (অন্তত মাস চারেক) সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। ওই সময়ের কোনো হাংরি বুলেটিনে অন্তত এই সময়ের উল্লেখ নেই। তখন যাঁরা লিখতেন এবং এখনও লিখছেন তাঁরা আমার কথার যাথার্থ্য বুঝবেন। আমি যা জানি এবং প্রয়োজনে মুদ্রিত প্রমাণ পেশ করতে পারি—শক্তি সম্প্রতি ১৯৬২ এপ্রিল সংখ্যায় 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' নামে দুটি কবিতা লেখেন। (সন্দীপন যা '১৯৫৮' ও 'গল্প' উল্লেখ করেছেন)। ওই একই সংখ্যায়, বিনয় মজুমদারের গ্রন্থ সমালোচনায় শক্তি শিরোনাম ব্যবহার করেন 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব / হাংরি

জেনারেশন।' হাংরি জেনারেশন বিষয়ক তাত্ত্বিকতাও এটিতে ছিল। সুতরাং এটিই সম্ভবত উত্তম তথা মলয় কথিত হাংরি-বিষয়ক মলয়ের পরিকল্পনার মূল ভাষ্য যেটি শক্তি মলয়ের মুখে শুনে কলকাতায় ফিরে **'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ'** নামে প্রকাশ করেন।

॥ নয় ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির রচনাটি এড়িয়ে যাওয়ার ও এটির গুরুত্ব-হীনতা প্রতিপাদনের প্রবণতা। বাসুদেব সম্প্রতিতে সন্দীপনের আত্মক্রীড়া প্রকাশের কথা জানেন অথচ মাত্র পাঁচ-ছ' মাস আগে প্রকাশিত শক্তির রচনার কোনো উল্লেখই করেন না। আবার মলয় সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির রচনার কথা জানেন অথচ রচনার সঠিক নাম জানেন না। দাদার যে বন্ধু তাঁর পরিকল্পনা আত্মসাৎ করে একটি আন্দোলনের প্রবর্তকের দাবিদার তাঁকেই নেতা করে ওই একই আন্দোলনের সূত্রপাত করা এবং দীর্ঘদিন আন্দোলনের নানা পুস্তিকা ও বুলেটিনে তাঁর আদর্শ ও রচনার প্রচার করাও বিস্ময়কর! আবার নিজে সম্পূর্ণত একটি আন্দোলনের সূচনা করে থাকলে, তার নেতৃত্বে থেকে নিজের নামের মাথায় সদ্য তরুণ সাহিত্যে প্রায় অপরিচিত এক অনুজ কবিকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেওয়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে কতটা সম্ভব সেটাও ভেবে দেখার মতো কথা। মলয়ের কথাগুলি উত্তমের বই থেকেই নেয়া এবং উত্তম স্বীকার করেছেন বইয়ের যাবতীয় তথ্য মলয় প্রমুখ হাংরি বন্ধুদের কাছেই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আমার ধারণা, এখানে কেউ বা কেউ-কেউ পরিকল্পিতভাবে প্রকৃত সত্য গোপন করছেন। শক্তি মলয়ের পরিকল্পনা আত্মসাৎ করেছেন, করতেই পারেন। এ রকম হামেশাই ঘটে, অসম্ভব কিছু নয়। আবার শক্তি যেহেতু পরবর্তীকালে সতীর্থদের ডুবিয়ে দিয়ে হাংরি ত্যাগ করেছেন, তার জন্য এদের একটা ক্ষোভ ও সেইজন্যই শক্তিকে অস্বীকার করার এত উৎসাহ এর মধ্যে কোনটা সত্য তা জানার আর উপায় নেই। কেননা বিতর্কের এই পরিস্থিতিতে কেউই সত্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের দেশে সে রেওয়াজ নেই। এখন নথিপত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে পাঠক ও সমালোচকদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমার বিবেচনায়—১৯৬২ এপ্রিলে সম্প্রতিতে শক্তির রচনা প্রকাশ তা কারো পরিকল্পনা বা প্রেরণায় হলেও হতে পারে। ১৯৬২ জুন-জুলাইয়ে ছোটগল্পতে শক্তির-গল্প 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' এবং ১৯৬২ অক্টোবর-নভেম্বর-এ হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের প্রথম প্রকাশ। ঘটনাগুলি এভাবেই ঘটেছিল। তবে এটা সত্য হলেও মলয়ের মূল অভিযোগ—মলয়েরই প্রাথমিক পরিকল্পনা শক্তি নিজের নামে সম্প্রতিতে প্রথম প্রকাশ করেছেন—তার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। কেননা মলয়ের অভিযোগ একাধিকবার মুদ্রিতভাবে প্রকাশিত হলেও শক্তি কখনও কোথাও তার কোনো প্রতিবাদ জানিয়েছেন এমন খবর আমার জানা নেই।

উপরের অংশে ছোটগল্পতে শক্তির লেখা ও হাংরির প্রকাশকাল আমার-স্মৃতি ও

অনুমান থেকেই বলছি। ছোটগল্পের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই। আর হাংরির প্রথম বুলেটিনে কোনো প্রকাশকাল ছিল না। স্মৃতি থেকে বলতে পারি, সম্প্রতিতে শক্তির লেখা প্রকাশের পরই জানতে পারি ছোটগল্পতে শক্তি অনুরূপ ক্ষুধা সংক্রান্ত একটি লেখা লেখেন যেখানে গল্পের নায়ক হাওড়ার ব্রীজও খেয়ে হজম করে ফেলছে, ইত্যাদি। লেখাটি আমি পড়িওনি। কিন্তু এই লেখাটির নাম বাসুদেব ও মলয় দু-জনের কথাতেই আছে। এ ধরনের কৌতুককর লেখার একটা স্মরণীয়তা চিরকালই থাকে সেই জন্যই হয়তো আমার স্মৃতিতে এটা স্পষ্ট এখনও। এ লেখা মুদ্রিত হলে উদ্দিষ্ট ছোটগল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখকরা আমার সপক্ষে বা বিপক্ষে তথ্যপ্রমাণ পেশ করলে আমরা সবাই উপকৃত হব। এ ছাড়া মলয়ের লেখাতেও উল্লেখিত আছে সম্প্রতিতে শক্তির রচনা প্রকাশ যার নাম ভ্রমবশত ছোটগল্পে প্রকাশিত গল্পের নাম বলে জানিয়েছেন। এবং এই সবের পরেই আর কাল বিলম্ব না করে ১৯৬২-তেই তিনি হাংরি প্রকাশ করলেন।

হাংরি জেনারেশনের উদ্ভবের এই বিতর্ক ও বিভ্রান্তিকে এড়িয়ে যদি এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিতে চাই, তাহলে বলতে হবে হাংরি কবি ও গল্পকাররা অধিকাংশই ছিলেন মূলত রোমান্টিক। এঁদের তাত্ত্বিক ধারণা ছিল—'কবিতা এখন জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। ছন্দে নয় কবিতা লেখা হবে গদ্যে।' এছাড়া কিছু দার্শনিকতা ও অতিদার্শনিকতা—যেমন কবিতা আত্মিক। 'এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মত স্বতঃস্ফূর্ততায়।' যাই হোক, মোট কথা, হাংরিদের রচনা চরিত্রে রোমান্টিক ও দার্শনিকতাধর্মী। প্রকরণে গদ্য ছন্দের ব্যবহার ও ছেদ চিহ্নের প্রায় লোপ বা অতি সীমিত ব্যবহার। আঙ্গিকের এই সরলীকরণ ও সরাসরি প্রয়োগ শ্রুতির ইস্তাহারেও আমরা পেয়েছি। এবং আধুনিক সাহিত্যে এটি প্রকরণ হিসেবে খুবই সার্থক ও ফলপ্রদ তা পরবর্তীকালে এক ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগের দ্বারাই স্বীকৃত হয়েছে।

এর সঙ্গে ছিল, এঁদের প্রচারিত সর্বাধিক বিতর্কিত ও সর্বাপেক্ষা উৎকটভাবে প্রকটিত ও সমালোচিত বৈশিষ্ট্য বিশেষ সংস্কৃত যৌনগন্ধী শব্দের ব্যবহার। এঁদের কিছু যুক্তি ছিল। সেটা পরে আলোচিত হবে। এখন, এই যৌনতা ও কৌতুক এই দুটিই ইদানীংকালে বাণিজ্যিক সাহিত্যের প্রধানতম উপাদান রূপে স্বীকৃত। যে কোনো বাণিজ্যসফল সাহিত্য ও বাণিজ্যিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে এ দুয়ের সহযোগে সাফল্য অবধারিত বলে গণ্য হয়। এখানে এই দুই উপাদান আলাদাভাবে নয় মিশ্রিত অবস্থায় ছিল—'কৌতুকময় যৌনতা'ই ছিল হাংরির আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য মধ্যবিত্ত আধাশিক্ষিত সাহিত্য পাঠকের কাছে। এই আধা বাণিজ্যিক ব্যাপারই ঘটেছিল হাংরি আন্দোলনে উদ্যোক্তাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এর দ্বারা তাঁদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাও হয়েছে আশাতীত।

এঁদের যুক্তি ছিল, বাস্তবতার প্রকাশ। বাস্তবতার প্রয়োজনে কোনো শব্দই অব্যবহার্য নয়—'থুতুকে আমরা থুতুই বলব, অধর রস বলার ন্যাকামি নয়।' কিন্তু এখানে প্রশ্ন

উঠতে পারে—তবে ওইসব লিঙ্গ, যোনি, অরগ্যাজম প্রভৃতি তৎসম ও বিদেশি শব্দের আড়াল কেন! ওই সব শব্দের আরো বাস্তব লৌকিক প্রতিশব্দ তো আছেই। এখনো গ্রামে বা শহরে রিক্সাওলা ঠেলাওলারা সেগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে। বাস্তবতার প্রয়োজনে ওই সব শব্দ ব্যবহারের ভীতি বা অনীহা প্রমাণ করে তাঁরাও পুরোপুরি ন্যাকামি মুক্ত ছিলেন না। অথবা এভাবে বাস্তবতা চর্চায় শিল্পেরই বারোটা বেজে যাবে। যত্র-তত্র প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই সব শব্দের ব্যবহার—শব্দগুলোকে পরিকল্পিতভাবে প্রায় গুঁজে দেয়ার হাংরির প্রবণতাকে সে সময় তাই অনেকেই সঙ্গত কারণে গিমিক বলে চিহ্নিত করেছেন। যার দ্বারা শর্ট কাট পদ্ধতিতে দ্রুত একটা প্রচার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

তাছাড়া এই অর্ধোচ্চারিত ও অবগুণ্ঠিত অশ্লীল তথা বাস্তবতার চর্চাও শুরু হয়েছে হাংরির অন্তত পাঁচ বছর আগেই পঞ্চাশের কবি লেখকদের দ্বারাই। সম্প্রতির প্রথম সংখ্যাতেই (১৯৬১) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালবাসা' কবিতাটি প্রকাশে সে সময় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল কবিতাটিতে 'পোঁদে' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। এ ছাড়াও তাঁর দু-তিন বছর আগে থেকেই যোনি, লিঙ্গ, সঙ্গম প্রভৃতি শব্দ আকছার ব্যবহৃত হয়েছে শক্তি সুনীল বিনয় সন্দীপন প্রভৃতির রচনায়, সেই কারণেই এই লেখার প্রথমাংশে উল্লেখ করেছি—ষাটের কবিতায় পঞ্চাশের চোরা স্রোতও অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুমাত্র হাংরিদেরই দোষ দিয়ে লাভ নেই, হাংরি-অহাংরি নির্বিশেষে ষাটের অধিকাংশ তরুণ কবিই পঞ্চাশের হৈ-হুল্লোড় ভরা আবেগী কবিতার দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

তা সে যাই হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই হাংরি আন্দোলনই ষাটের সব চেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত সাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলন নিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কোর্ট কাছারি উত্তেজনা হয়েছে এমন নয়, বহির্বঙ্গে প্রায় সারা ভারতে এমনকি বিদেশের সংবাদপত্র ও লেখক মহলেও আলোড়ন জেগেছে—তা সে যেমন ভাবেই হোক। প্রশ্ন উঠবে, কেন? ও কীভাবে? হঠাৎ কবিতার মতো নির্দোষ ও নিরীহ একটা বিষয় নিয়ে আইন—পুলিশ ও প্রশাসন সবাই এত তৎপর হল কেন? বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, হাংরি নথিপত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার, জেল, হাজত, আদালত! গত তিরিশ বছরে প্রশাসনে এমন কিছু পরিবর্তন আসেনি। কলকাতায় কত কী হয়, রীতিমতো পর্নোগ্রাফি পুলিশের নাকের ডগাতে বিক্রি হয় এখন এবং তখনও। এসব নিয়ে এত উত্তেজনা কখনো চোখে পড়েনি। হাংরি নিয়ে এসব হল কেন? কী ছিল এ সবে? কিছু রোমান্টিক গল্প কবিতা ও ঘোষণা—যার মধ্যে ছড়ানো ইতস্তত কিছু যৌন শব্দ তৎসম ও বিদেশি শব্দে—তাও আবার যে বাক্যে আশ্রিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার অন্বয় ও অর্থ উদ্ধারই দুরূহ। তাও ছাপা হয় দু-তিনশো কপি, পড়ে দলীয় বা ওই মতাদর্শে আগ্রহী কতিপয় ছেলে-ছোকরারা।

এর দ্বারা জনরুচি দূষিত হবে, পুলিশ তৎপর হবে এমন কথা ভাবাই কষ্টকর। তবু এটাই সে সময়ে ঘটেছিল। তাই…কেন?
আসলে ওই আধো-আধো নুনু বা হিসি মার্কা অশ্লীলতা কিংবা শিশ্ন, শীৎকার বা অরগ্যাজম জাতীয় শব্দের প্রতিক্রিয়ায় নয়, হাংরি লেখকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগই পুলিশকে সক্রিয় হতে বাধ্য করেছিল। প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লোভে তাঁরা বাণিজ্যিক লেখক বা রাজনৈতিক নেতাদের কায়দাতেই দিনের পর দিন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের (হাংরি ব্যাখ্যায় এঁরা সকলে প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক ধারণার ও বাণিজ্যিক সাহিত্যের পোষক বলেই এই ক্ষোভ) নানাভাবে চিঠি, টেলিফোন, প্রচার পুস্তিকার দ্বারা অপমান ও উত্যক্ত করেছেন। এই তালিকায় আছেন—তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, পুলিশ কমিশনার দেবী রায় (ওই সময়ই হাংরি বুলেটিনে সম্পাদক বলে উল্লেখিত দেবী রায় হারাধন ধাড়া থেকে এফিডেভিট করে দেবী রায় হলেন কমিশনারকে ব্যঙ্গ করার জন্যই), এছাড়া ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ। এঁদের কাছে ছাপানো চিঠিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল—কলকাতার সাঁওতালি যুবতী রমনীর নগ্ন বক্ষের প্রদর্শনী দেখার জন্য, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, অবিবাহিত তিনি কীভাবে যৌনজীবন যাপন করেন। পুলিশ কমিশনারের স্ত্রীর ঠিকমতো অরগ্যাজম হয় কিনা। ইত্যাদি। স্বভাবতই এসব নিয়ে আলোড়ন হয়েছে। সংবাদপত্রে রচনা প্রকাশ পেয়েছে। হাংরিদের প্রায় সব বন্ধুই সাংবাদিক। সে সব সংবাদের কাটিং বহির্বঙ্গে বা বিদেশে পাঠাতেও দেরি হয়নি। এঁরা প্রচার চেয়েছিলেন খুবই পরিকল্পিতভাবে। এবং পেয়েওছিলেন অনেকটাই। হাংরি আন্দোলনকারীরা ভালভাবে প্রথম থেকেই জানতেন শুধু লিখে আর বুলেটিন ছাপিয়ে আন্দোলন হয় না। বাস্তবতার চর্চা তাঁরা ভালভাবেই করেছিলেন।
তরুণ লেখক শিল্পীদের প্রচারের বাসনা ও তার জন্য কিছু কৃচ্ছ্রসাধনা ও উল্টোপাল্টা ব্যবহার সব যুগেই হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকেই ফরাসি দেশে সুররিয়ালিস্ট লেখক শিল্পীরা অনেক কাণ্ড করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্তত তিরিশ ও পঞ্চাশ দশকে যথেষ্ট উন্দামতা দেখা গেছে। তাঁরা প্রচলিত ও স্বাভাবিক সাহিত্যরুচির বিরুদ্ধে অনেক উত্তপ্ত লেখা লিখেছেন, পঞ্চাশের কবিরা তো এ সবের সঙ্গে মহাজনদের ব্যঙ্গ করে বা নিজেদের নিগৃহীত করেও ইমেজ তৈরির চেষ্টা করেছেন। মদ খেয়ে পুলিশের সঙ্গে মারামারি—লক-আপে রাত কাটানো বা ওয়েলিংটনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা সবেরই কথা বলা যায়। ছয়ের দশকে শ্রুতি ও এই দশকের রচনারীতি বা স্লোগানও ওই তারুণ্যের আত্মঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। একবার গিনসবার্গও নাকি আমেরিকায় তাঁর Howl কবিতার অর্থ বোঝাবার জন্য কোনো মঞ্চে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বলেছিলেন—see the meaning! কিন্তু এসব কোনো কিছু নিয়েই কোনোদিন এতদূর ঝামেলা ও গণ্ডগোল হয়নি। হাংরিদের

ক্ষেত্রে হল কেন? কারণ আগেই বলেছি, হাংরি সদস্যরাই এই আইনি বিতর্ককে আমন্ত্রণ ও পুষ্ট করেছেন। ক্ষমতাসীন লেখকরা ও নেতৃবৃন্দ চক্রান্ত করে এসব করেছে এ সম্পূর্ণ বাজে কথা। পরীক্ষাশীল কিছু তরুণ লেখকদের কিছু আস্ফালন ও চীৎকার চেঁচামেচির দ্বারা এঁদের কিছুই এসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

॥ দশ ॥

হাংরি পঞ্চাশেরই সন্তান এবং এটা কোনো আন্দোলন নয়, নেহাৎ বিদ্রোহ—প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে নতুন সাহিত্যের সূচনা সব সাহিত্য আন্দোলনেরই কথা। কিন্তু তার জন্যে তো রসদ দরকার। খালি পেশী আর লাঠি-সোটা এবং কিছু ভাবাবেগ দিয়ে কামান বন্দুকের মোকাবিলা করার চেষ্টা অর্থহীন হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়। হাংরি আন্দোলনও একই রকম—সাঁওতাল বিদ্রোহ বা বড়জোর নকশাল আন্দোলনের সমগোত্রের ব্যর্থ আন্দোলন। যদিও এসব ব্যর্থতারও কিছু না কিছু মূল্য থাকেই। কিন্তু ওইসব বিদ্রোহীর অভীপ্সিত লক্ষ্য ও দাবির পক্ষে তা যৎসামান্য।

একবার শঙ্খ ঘোষ হাংরিদেরই একটি পত্রিকায় প্রায় এই ধরনেরই—হাংরিদের সঙ্গে নকশালদের ব্যর্থ আন্দোলনের তুলনা করে কিছু লিখেছিলেন। সাতের দশকে হাংরি জেনারেশন নামে প্রকাশিত এই পত্রিকাই সম্ভবত শেষ হাংরি কাগজ। পত্রিকাটি চলন্ত ট্রেনে আমাকে দিয়েছিলেন হাংরির বিশিষ্ট গল্পকার সুভাষ ঘোষ। তখন হাংরি সর্ব অর্থেই স্তব্ধ। পরের সংখ্যাটি স্টলে দেখে কিনে নিলাম। দেখি, আগের সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষের লেখার প্রতিবাদ করে একটি নতুন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম মনে নেই। সেখানে দেখি, আগের লেখার জন্যে শঙ্খ ঘোষকে অতি কদর্য ভাষায় (অবশ্যই সংস্কৃতে) খিস্তি করা হয়েছে। এমনকি এক জায়গায় অণ্ডকোষ চুলকোনোর কথাও ছিল।—পড়ে মনে হল একে শঙ্খ ঘোষ তায় 'নিজস্ব অণ্ডকোষ কণ্ডূয়ন' করার কথা!—পড়েই হয়তো উনি—হা রবীন্দ্রনাথ! বলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আমার কষ্ট হল, রাগও হল। আন্দোলন বা আন্দোলনের কাগজ তো আমরাও করেছি। কিন্তু একজন অগ্রজ সম্মানীয় লেখককে আহ্বান করে খোশামোদ করে লেখা নিয়ে, সেই লেখা নিজেদের মনোমতো না হওয়ায় তাঁকে সমালোচনাও নয়, নিতান্ত গ্রাম্য ভঙ্গিতে অপমান করা কী ধরনের সাহিত্য আন্দোলন! আমি একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র লিখলাম। সাহিত্যাদর্শে আমি শঙ্খ ঘোষের অনুসারী নই। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ও প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আদর্শের।

কৃত্তিবাস পত্রিকায় চিঠি পাঠানোর অভিজ্ঞতা ও বন্ধুদের পরামর্শে এ চিঠি শেষ পর্যন্ত আর হাংরি কাগজে পাঠাইনি। সেই সময়েই মাস কয়েকের মধ্যে, যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর প্রকাশিতব্য পত্রিকা চিল-এর জন্য সাম্প্রতিক কবিতার উপর দীর্ঘ একটি রচনা চাইলেন। দু কিস্তিতে প্রকাশিত ওই লেখায় আমি এই প্রসঙ্গ সাধ্যমতো ব্যবহার করেছি। কিন্তু এত খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ সেখানে ছিল না। এখন নিশ্চয়ই বলব—

সমালোচনায় এত বিচলিত হওয়া বা প্রতি-আক্রমণের এই উগ্রতা নিজেদের সাহিত্য-ভিত্তির দুর্বলতা আত্মবিশ্বাসের ও সাহিত্যরুচির অভাব ছাড়া সম্ভব নয়।

আন্দোলন হিসেবে হাংরি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, এই আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিন্দুমাত্র নেই। হাংরির ওই উচ্চকণ্ঠে চিৎকৃত শারীরিক কবিতা সম্পূর্ণভাবে উত্তরকালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া, আন্দোলনের প্রধান লেখকরা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় অথবা নীরব। কবিদের মধ্যে মলয়, শৈলেশ্বর, বা সুবো আচার্য বছরে দু-চারটি লেখা লেখেন। এদের মধ্যে দেবী রায় প্রায় নিয়মিত হলেও তাঁর লেখায় হাংরি ছাপ কোনো কালেই ছিল না। মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে আসা সদ্য তরুণ এক যুবক হারাধন ধাড়া কবিতা লেখালেখির তাড়নায় প্রায় ঘটনাচক্রে এই 'ং' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দেবীকে সে সময়ে আমরা আড়ালে বলতুম পিয়নং অর্থাৎ হাংরির পিওন। যাবতীয় হাংরি বুলেটিন বা পত্র-পত্রিকা দেবী ওরফে হারাই পোস্টিং অথবা বিলি করত। দেবীর কবিতা বরাবরই হাংরির ভাল-মন্দ উভয় প্রভাব থেকেই মুক্ত এবং হয়তো সেইজন্যই দেবীই হাংরিদের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়াশীল কবি।

কিছুদিন আগে শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে একজন প্রাক্তন হাংরি কবিকে দেখলাম। পরিচয় করিয়ে না দিলে উভয় পক্ষেরই চেনার কোনো উপায় ছিল না। প্রায় তিরিশ বছর পর দেখা। চেহারা চরিত্র সবই বদলে গেছে। আমি চমৎকৃত হলাম এই ভেবে, ক' বছর আগেই যে এবং যারা শঙ্খ ঘোষকে ওইভাবে গালাগাল ও অপমান করেছে আজ সেই এসে শঙ্খ ঘোষের প্রসাদ প্রার্থনা করছে। আর শঙ্খ ঘোষও সব ভুলে তাকে কোল দিয়েছেন। দেখলাম হাংরি কবি মাঝে মধ্যে চালাক কথাবার্তা বললেও বেশ বিনীত ও নম্র আর শঙ্খ ঘোষও নতুন আশ্রমবালকের প্রতি বেশ স্নেহশীল আচরণ করছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, হাংরিরা গুরু ছাড়া চলতে পারে না আর শঙ্খ ঘোষেরও চ্যালা ছাড়া চলে না। হাংরিদের প্রথমে ছিল শক্তি সন্দীপনের মতো চরমপন্থী গুরু এখন শঙ্খ ঘোষের মতো নরমপন্থী। শঙ্খ ঘোষের সম্বন্ধে আমার ধারণা, শ্রদ্ধাযোগ্য অনেক ব্যাপার থাকলেও তাঁর চরিত্রে জনপ্রিয়তার প্রতি একটা আকর্ষণ ও গুরুগিরি করার একটা প্রবণতা বেশ কিছুদিন যাবত এসে গেছে। এখন প্রতি রবিবার (যখনই ক্বচিৎ রবিবার শঙ্খ বাবুর বাড়িতে গেছি) কিছু কিশোর কিশোরী কবিদের ভিড় ও আচার্যের ভঙ্গিতে শঙ্খ ঘোষের আনুকূল্য। অন্তত দশ পনের বছর আগেও শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে এ অভিজ্ঞতা তাদের পীড়িত করবেই। একি বয়সের দোষ নাকি আমাদেরই অজ্ঞতা ওই সব তরুণ মহাপ্রতিভাকে বুঝতে পারছি না।

হাংরিদের বর্তমান অবস্থা বোঝাতেই চেয়েছিলাম। মাঝে কিছু প্রসঙ্গান্তর হয়তো ঘটে গেছে। একথা বলতেই হবে, হাজার ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ওই সময়ে, কিছু তরুণকে ঐক্যবদ্ধ করে ওই ধরনের একটা আন্দোলন সংগঠন ও দেশ-বিদেশে তাকে ছড়িয়ে দেয়া ও

সাহিত্য নিয়ে ওই ধরনের হৈ চৈ করার সাংগঠনিক দক্ষতার যে পরিচয় হাংরি লেখকরা দিয়েছিলেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। এই আন্দোলনের দেবী রায় ও সুবিমল বসাক এখনও লিখে চলেছেন। দেবীর কথা আগেই বলেছি। সুবিমল চরিত্রে বিপ্লবী ও মৌলিক লেখক। কিন্তু এটাকে ঠিক হাংরি ঘরানা বলে আমার মনে হয় না। সুবিমল এক নিজস্ব রীতিতে শুরু থেকেই লিখে আসছেন। সুবিমলের লেখা আমার কাছে খুবই আধুনিক ও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। হাংরিদের কাগজে সুবিমল কিছুদিন কিছু লেখা লিখেছিলেন। সে সব কথাও হয়তো সুবিমল ও তাঁর পাঠকদের স্মৃতিমাত্র। সেভাবে বললে আমিও তো দু-একটা লেখা হাংরি কাগজে লিখেছি।

॥ এগারো ॥

হাংরি (১৯৬২-৭২), শাস্ত্রবিরোধী (১৯৬৫-৭৬), শ্রুতি (১৯৬৫-৭১) এই তিন আন্দোলনে শাস্ত্রবিরোধী শুরু হয়েছে 'এই দশক বুলেটিন (১৯৬২) থেকে এবং শ্রুতিরও উৎস ওই বুলেটিন। সুতরাং শাস্ত্রবিরোধী ও শ্রুতি প্রায় যমজ আন্দোলন, একটি গল্পের অন্যটি কবিতার। গল্প আন্দোলনের কাগজ এই দশক-এর মধ্যাবস্থায় যোগ দেন অমল চন্দ। এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেন। অমল তার পঁচিশ বছরের বেশি সাহিত্য জীবনে কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থান পায়নি। সে চেষ্টাও করেনি। এখন ও প্রায় অবসৃত পাগল ও বাতিল লেখক। গত পাঁচ-বছরে পাঁচটিও লেখা লিখেছে কিনা সন্দেহ। অমলের প্রতিটি লেখাতেই চমক ও আবিষ্কার। প্রবন্ধের হাতও চমৎকার। সাতের দশকে গল্প লেখার ফাঁকেই প্রকাশ করল উপন্যাস—অভিযোগ (১৯৭২), এর সামান্য আগে পরে অতীন্দ্রিয়র উপন্যাস 'সেসে' প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে। বছর চার-পাঁচ পরে লেখা হল রমানাথের প্রথম উপন্যাস 'সাক্ষাৎকার' প্রথম পর্যায়ের ঈগলে ধারাবাহিক-ভাবে। পরে আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যায় 'ছবির সঙ্গে দেখা।' ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় এই সব লেখক পূর্ববর্তী উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা ও আধুনিক উপন্যাসের আদর্শ নিয়ে কিছু লেখালেখি চালাচ্ছিলেন। এভাবেই শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের পাশাপাশি শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাসেরও একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হল। নাম—'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো'। উদ্যোক্তা অমল চন্দ। সহযোগী অতীন্দ্রিয় পাঠক।

এই দশক শাস্ত্রবিরোধী পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার পরই সমমনস্ক কিছু তরুণ গল্পকার আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমকালীনদের মধ্যে অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানার নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এঁরা ছাড়াও তরুণতর এক লেখক সম্প্রদায় সেই সময়ে নেপথ্যে এক নতুনতর রীতি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই তরুণ লেখক সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন—আশিস মুখোপাধ্যায়, তাপস চৌধুরী, পার্থ গুহবক্সী, অমল দত্ত, চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর নন্দী, মনোজ চাকলাদার প্রমুখ। এঁদেরই সম্মিলিত

প্রয়াসে সাতের দশকে প্রথাবিরোধী রীতির একমাত্র গল্পপত্রিকা—'নতুন নিয়ম' প্রকাশিত হয় বোধ হয় ১৯৭৫-৭৬ সালে। ওই সময়ই প্রথম পর্যায়ের ঈগল বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। অবশেষে ১৯৭৭-এ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের একক উদ্যোগে ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগল কোনো দলীয় মুখপত্র ছিল না, কিন্তু এটিতে দলেরই—এই দশক শ্রুতি নতুন নিয়ম প্রভৃতি পত্রিকার পরীক্ষাশীল নতুন লেখকদের লেখা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ও অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছাপা হত। যদিও প্রথম পর্যায়ের (কেবল সদস্যদের জন্য) কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ভেঙে পাশাপাশি ষাট-সত্তরের অন্যান্য লেখক এমনকি পঞ্চাশ বা চল্লিশের কবি লেখকরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। শক্তি সুনীল সন্দীপনের সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্তোষ কুমার ঘোষ বা বিমল করও এই পর্যায়ে লিখেছেন। আমি কাগজকে সম্প্রতির ঢঙেই বহুমুখী সাহিত্যাদর্শের একটা মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম আমরা যেমন অগ্রজদের সমালোচনা করেছি তেমনি তাঁদেরও বক্তব্য আমরা শুনব ও প্রয়োজনে সাহিত্যিক বিতর্কের সূত্রপাত হবে। কিন্তু লেখা কম বেশি ছাপা হওয়া, সমালোচনার বিরুদ্ধতায় অসহিষ্ণুতা নিয়ে দলপাকানো নানা নোংরামি ও অবাঞ্ছিত অবস্থার চাপে বিরক্ত ও বাধ্য হয়ে পত্রিকা বন্ধ করলাম।

১৯৮৪-৮৫ নাগাদ ঈগল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুটা আগে থেকেই, অমল চন্দের সম্পাদনায় ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো বুলেটিন তথা পত্রিকার প্রকাশ। এখানে বিভিন্ন সংকলনে প্রচলিত সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের বিরুদ্ধে নানা প্রবন্ধ ও মৌলিক রচনার প্রকাশ হয়েছে।

ওই সব সঙ্কলন বা বুলেটিনে এবং সামান্য পূর্ববর্তী নতুন নিয়মে নিয়মিতভাবে নতুনতম আঙ্গিকের গল্প উপন্যাসের প্রকাশ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা পুরনো উত্তেজনা বা সঙ্ঘবদ্ধতার কথা বাদ দিলে ষাটের ঐতিহ্যময় গদ্য ধারাটিরই যেন নবীকরণ ঘটল। ততদিনে এই দশক বন্ধ হয়েছে। প্রাক্তন সদস্যরা কেউ কেউ বাণিজ্যিক কাগজে ভিড়ে গেছেন, কেউ কালে-ভদ্রে লিখছেন, কেউ দু-এক বছর লেখার পর অতলে তলিয়ে গেছেন, কেউ বা তেমন সুবিধে করতে না পারলেও নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সব হাফ-বিপ্লবী পড়তি মাস্তানরা তখন মাঝে মধ্যেই ঈগল, নতুন নিয়ম বা ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো কিংবা এই ধরনের আরো দু-একটি কাগজে গত জন্মের চোঁয়া ঢেকুর তুলছেন এই অবস্থাতেই সাতের দশকে কিছু তরুণের প্রযত্নে শাস্ত্রবিরোধিতা তথা সাহিত্যে নতুনরীতি ও চিন্তাভাবনার চর্চা হয়েছে। এ সবই ষাটের আন্দোলনের পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া—শেষপর্বের কথা।

এছাড়া আলাদাভাবে বলতে হয় অতীন্দ্রিয় পাঠকের কথা। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কৃতী ছাত্র এবং বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর দক্ষ অফিসার শ্রীশ্যামল ধর অতীন্দ্রিয় পাঠক নামের আড়ালে প্রায় তিরিশ বছর যাবত লিখে চলেছেন। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা সবেতেই তিনি সিদ্ধ হস্ত। ব্যক্তিগতভাবে আমি অতীন্দ্রিয়র কবিতা ও প্রবন্ধের

দীর্ঘকালের মুগ্ধপাঠক। তাঁর গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে আমার কিছু সংশয় ও প্রশ্ন ছিল। লেখক আমি যেমনই হই, পাঠক হিসেবে অন্তত সাধারণের চেয়ে কিছু উঁচুতে এমন অভিমান ও দাবি আমার চিরদিনই ছিল এবং আছে। প্রথম দিকে অতীন্দ্রিয়র গল্প উপন্যাস প্রায় পড়তেই পারিনি। পাতায় পাতায় চিত্রকল্প ও চিত্রনাট্য। বস্তুত কবিতা চলচ্চিত্রের এমন মিশ্রণ আগে কোথাও পাইনি। এমন জটিল বিষয় ও আঙ্গিকে লেখা কমলকুমারের আগে আর কেউ চর্চা করেননি। অবশ্য ইদানীং অতীন্দ্রিয় আমার কাছে এতটা দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে না। তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস—'বৃত্তিমছিলে মানুষেরা ও পবন সেন' আমি কষ্ট করে হলেও পড়ে উঠতে পেরেছি। এর দ্বারা অতীন্দ্রিয় ক্রমশ আমাদের মতো পাঠকের কাছে বোধ্য ও সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠছেন না আমরাই ক্রমশ তাঁর লেখন রীতিকে বোঝার মতো শিক্ষিত হয়ে উঠছি তা বলা কঠিন।

ষাটের প্রায় শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখে যাওয়া ও সেই সঙ্গে সতীর্থ সমমনস্ক কবি লেখকদের অত্যাধুনিক দুরূহ রচনাবলি প্রকাশের উপযুক্ত পত্রিকার প্রকাশ—এই দ্বিবিধ কর্ম পূর্ণ যোগ্যতা ও সার্থকতার সঙ্গে পালন করার অনন্য কৃতিত্ব অতীন্দ্রিয় পাঠকের। পূর্ব আলোচিত কোনো সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থেকেও অতীন্দ্রিয় স্বয়ং এক তকমাহীন আন্দোলন। বোধ হয় ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ অতীন্দ্রিয় জ্ঞাতিভ্রাতা তপনলাল ধরের সঙ্গে যুক্তভাবে কালক্রম প্রকাশ করেন। পরে এককভাবে 'অব্যয়' ও শেষে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের 'কালক্রম' (পুষ্কর দাশগুপ্তর সঙ্গে যুক্তভাবে) এবং আবার এককভাবে 'অব্যয়', এইসব প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী লেখকরা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। যে রচনা বাণিজ্যিক কাগজ তো দূরের কথা, অবাণিজ্যিক সাধারণ লিটল ম্যাগাজিনেও ছাপাতে কেউ উৎসাহী নয়, পাঠক হাজারে একজনও আছে কিনা সন্দেহ, সেই লেখা এবং সেই সব লেখা নিয়ে প্রচার-প্রবন্ধ-আলোচনা ছাপিয়ে কেউ কাগজ করছেন গাঁটের পয়সা খরচ করে কোনোরকম ফেরতের প্রত্যাশা না করে শুধু আদর্শের জন্য—এসব শুধু ষাটের লেখকদের পক্ষেই সম্ভব।

একইরকম প্রয়োজনেই ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ের বা নতুন নিয়ম বা ছাঁচ ভেঙে ফ্যালোর প্রকাশ। ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো প্রকাশনার প্রথম ও সম্ভবত একমাত্র প্রকাশনা—'বাংলা উপন্যাস ১৯৮৬'। সম্পাদনায় অমল চন্দ ও অতীন্দ্রিয় পাঠক। প্রত্যেকে একটি করে উপন্যাস লিখেছেন—অমল চন্দ, অতীন্দ্রিয় পাঠক, আশিস মুখোপাধ্যায় ও তাপস চৌধুরী। এটিই ষাটের লেখকদের ঘোষিত ও নামাঙ্কিত শেষ সাহিত্য আন্দোলন।

স্বভাবতই দেশের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত অধিকাংশ লেখক ও সম্পাদকদের দ্বারা এঁরা ধিক্কৃত ও অবজ্ঞাত হয়েছেন। ব্যতিক্রম হিসেবে শুধু নাম করা যায় প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ ও প্রবীণ শিবনারায়ণ রায়ের কথা। এঁরা বিভিন্ন সময়ে মৌখিক ও লিখিত

আলোচনায় এইসব পরীক্ষাশীল তরুণ প্রতিভাকে যথোচিত স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়েছেন।

উপরিউক্ত এই সব আন্দোলন ও পত্রপত্রিকা ছাড়াও কলকাতায় ও বহির্বঙ্গে অনেক পত্রিকা এবং গোষ্ঠীও নিজেদের আদর্শ ও সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রসারে সার্থক ভূমিকা নিয়েছেন। দুর্গাপুরে (অধুনালুপ্ত) নিম-সাহিত্য— নামের একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই ষাটের মধ্যভাগেই এরকম একটি আন্দোলন স্বল্পকালের জন্য আলোড়ন জাগিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ষাটের সাহিত্য আন্দোলনের ধারা—তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আরও দূর-বিস্তারী। সময়ের হিসেবে আন্দোলনের শেষ উপন্যাস সঙ্কলন তো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬তে। কিন্তু এই ১৯৯২ পর্যন্ত অব্যয়, মহাদিগন্ত, কৌরব, পিলসুজ, মানস ভূমি, অমৃতলোক, কার্তুজ এমনি আরো অজস্র স্বধর্মনিষ্ঠ চরিত্রবান লিটল ম্যাগাজিনে যে নতুন সাহিত্যের প্রস্তুতি প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতার আদর্শ তা ষাটের সচেতন সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে একই ধারায় যুক্ত বলেই আমার বিশ্বাস।□